নব্যবিজ্ঞান
ও
অধ্যাত্মজ্ঞান

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী
১৩৬২

প্রকাশক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রথম সংস্করণ :
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

462/55/1000

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব্ব

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	প্রগতি	১
২।	বিজ্ঞানে ও অধ্যাত্মে	১১
৩।	নব্যবিজ্ঞান	২০
৪।	অধ্যাত্মে ও বিজ্ঞানে	৩১
৫।	বৈজ্ঞানিকের ভগবান	৪৯
৬।	বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান	৫৭
৭।	বিবর্ত্তনে যুগসন্ধি	৭১
৮।	মায়াময় জগৎ	৮৩
৯।	চেতনার ক্রমগতি	৯৫

দ্বিতীয় পর্ব্ব

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০।	বৈজ্ঞানিক ভেল্কি	১০৫
১১।	জড় আছে কি ?	১১১
১২।	আলোর স্বরূপ	১২০
১৩।	কালের মাপ	১২৭
১৪।	সরল আপেক্ষিকতাবাদ	১৩৩

প্রথম পর্ব্ব

প্রগতি

মানুষের সত্যসত্যই উন্নতি হইয়াছে কি? জীবনের পথে বরাবর সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? কি হিসাবে, কোন দিকে, কতখানি?

এক সময়ে এই উন্নতি—আধুনিক ভাষায়, এই প্রগতির কথাটা খুব জোর গলায় ঘোষণা করা হইয়াছিল। মানুষ যে অতি দ্রুত আপনাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া চলিয়াছে, মনকে প্রাণকে শুদ্ধ শাণিত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সত্বরই সে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ জীব হইয়া উঠিবে—এ-সম্বন্ধে রোমান্টিক্ যুগের প্রথম স্বপ্নালুদের কোন সন্দেহই ছিল না। প্রাচীনতর যুগের মানুষ হইতে আধুনিকেরা কত দিকে কত ভাবে কত দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আধুনিকের তুলনায় প্রাচীনেরা যে মোটের উপর শিশু—এই কথাটা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারপর জড়বিজ্ঞান যখন তাহার অত্যদ্ভুত জ্ঞান ও শক্তি সব মানুষের হাতের মধ্যে আনিয়া দিল তখন ত আর দ্বিরুক্তি করিবার কিছুই রহিল না।

বিজ্ঞান তাহার বিবর্ত্তনবাদে এই সত্য আবিষ্কার করিল যে, সমস্ত সৃষ্টিই ক্রমিক উন্নতির পথে চলিয়াছে—প্রথমে ছিল কেবল জড়, পরে আসিল জীবন, তারপরে চেতনা মনবুদ্ধি; আদিতে ছিল আগুন উত্তাপ, তারপরে জলবায়ু, তারপর গাছপালা, তারপর জীবজন্তু—সকলের শেষে আবির্ভাব মানুষের। মানুষও প্রথমে ছিল বন-মানুষ, বন-মানুষ ক্রমে হইল আদিম অসভ্য মানুষ, আদিম অসভ্য মানুষ উন্নত হইতে হইতে আধুনিক সভ্য মানুষে পরিণত হইয়াছে। উন্নতি আর কাহাকে বলে? শীঘ্রই যে মানুষ আকাশ ফুঁড়িয়া এক দেবলোকে উঠিয়া বসিবে, তাহারও আশু সম্ভাবনায় অনেকে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

প্রথম যুগের এই সরল অনাবিল আস্থা ও উৎসাহ কিন্তু বেশিদিন টিঁকিয়া রহিল না। অতীতের ইতিহাসের সহিত বিজ্ঞান যতই ঘনিষ্ঠ-তর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে লাগিল অতীতকে যতই গভীরতর ব্যাপকতর ভাবে খুঁড়িয়া টুঁড়িয়া চলিতে লাগিল, ততই সে দেখিল উন্নতি যদি বাস্ত-বিকই হইয়া থাকে তবে ও-জিনিষটি সোজা একটানা পথে অল্প মেয়াদে —দুই-চার সহস্র বৎসরের মধ্যে ঘটে নাই। মানুষের উৎপত্তি-স্থান আবি-ষ্কার করিতে গিয়া আমরা ক্রমেই দূর হইতে দূর অতীতে চলিয়া যাইতেছি। মানুষ দূরের কথা, সভ্য মানুষেরই গোড়া পাওয়া যায় না। সভ্যতার পশ্চাতে সভ্যতার ক্রম যে কত অতীতে প্রসারিত, তাহার হিসাব লওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জগতে আজও তথাকথিত আদিম অসভ্য মানুষ আছে—কিন্তু কবে সমগ্র মানবজাতিই ছিল আদিম অসভ্য? তাই অনেক বৈজ্ঞানিক বলিতে স্বরু করিয়াছেন, আদিম অসভ্য নামে আজ যাহাদিগকে আমরা অভিহিত করি, তাহারা একটা প্রাচীন সুমহান সভ্যতার বিকৃত ধ্বংসাবশেষ মাত্র। জ্ঞাত অতীতের ওদিকে ধীরে ধীরে আমরা যতই চলি না কেন, দেখি কোন না কোন মানব-সঙ্ঘ তাহার সভ্যতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, এইসব সভ্যতা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে মোটের উপর প্রায় একই ধরণের ছিল। অতি-আধুনিক আমরা, আমাদের অশন বসন ব্যসনের যত উপচার লই-য়াই গর্ব্ব করি না কেন—তদনুরূপ দ্রব্যসম্ভারই আজ আমরা আবিষ্কার করিতেছি মিশরের ভূগর্ভে, গোবিমরুর বালুতলে, ইরাকের ক্রীটের সিন্ধুর মাটির অন্তরালে। হাতেকলমে প্রমাণ পাইতেছি, আজ আমরা যত যত্নে নৈপুণ্যে প্রসাধন করি, প্রেম করি, শিল্প রচনা করি, রাজ্যশাসন করি, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও মানুষ মোটের উপর একই ভাবে ঐ একই জিনিষে অভ্যস্ত ছিল।

তবুও অতীতে ও অধুনায় যদি কিছু বা যাহা কিছু পার্থক্য আসিয়া

থাকে, তবে তাহা দেখাইতে হইলে যাইতে হয় বিজ্ঞানেরই দুয়ারে। জড়বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির উপর মানুষ যে কর্তৃত্ব পাইয়াছে এবং তদ্দ্বারা জীবনযাত্রার প্রণালীকে যতখানি সুগম সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাই আধুনিকের বিশেষত্ব। প্রকৃতিকে আমরা করায়ত্ত করিয়াছি, প্রকৃতিকে দিয়াই প্রকৃতিকে আমরা বাঁধিয়া ফেলিয়াছি, তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছি মানুষের সেবায়। অবশ্য এখানেও বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির উপর আধুনিকের দখল আকারে বা পরিমাণে যতই বিপুল হৌক না কেন, প্রকারে বা গুণ হিসাবে তাহা যে প্রাচীনের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা সন্দেহের বিষয়। আগে যে কাজের জন্য সহস্র লোক খাটিত, এখন হয়ত একটি কি দুইটি লোক আছে একটি যন্ত্র লইয়া। আগে শত শত প্রদীপ যেখানে প্রয়োজন হইত, এখন তাহার কাজ করিতেছে দুই-চারিটি বৈদ্যুতিক আলো। আগে যাহা সম্পন্ন করিতে লাগিত বৎসর, এখন তাহাতে মাস বা সপ্তাহই যথেষ্ট। মাস মাস ধরিয়া পূর্ব্বে যে-পথ অতিবাহন করিতাম, এখন সেখানে যাই তিন ঘন্টায় উড়িয়া। এই ভাবে যন্ত্রপাতির কল-কারখানার কল্যাণে আমাদের সকল কার্য্য সংহত ক্ষিপ্র ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যের আকৃতি নয় প্রকৃতি, জীবনের রূপ নয় ছন্দ তাহাতে কতখানি পরিবর্ত্তিত? জড়বিজ্ঞান জীবনের কাঠামো অনেকখানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতেছে, কিন্তু জীবনের অন্তঃস্থলে মর্ম্মে কতখানি স্পর্শ করিয়াছে—মানুষের চেতনায় আনিয়াছে কোন নূতন দর্শন, নূতন গতি?

এই ভাবে এক দিক দিয়া দেখিলে মনে হয় মানুষের আসল উন্নতি দূরের কথা, বিশেষ পরিবর্ত্তনও কিছু ঘটিয়াছে কি-না সন্দেহ—মানুষ আছে স্থাণুবৎ যথাপূর্ব্বং তথাপরং।

কিন্তু তাহা নয়; আরও গভীরতর দৃষ্টিতে দেখিব মানুষের পরিবর্ত্তন, উন্নতি, প্রগতি ঘটিয়াছে, ভিতরের দিক দিয়াই—মতিগতির,

চেতনারই হিসাবে। চেতনারই বিকাশ বা বৃদ্ধি হওয়া সেই পরিবর্ত্তনের লক্ষণ ; সেই প্রগতির মূল কথা এই যে, মানুষ দিনে দিনে বেশি সচেতন হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বহির্জীবনে, কর্ম্মের আয়তনে মানুষ যে বর্দ্ধিত জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিতেছে তাহা এই বর্দ্ধিত চেতনার ফল—বাহিরে মানুষের জ্ঞান ও শক্তি ততখানি প্রসার পাইয়াছে, ভিতরে যতখানি তাহার চেতনা জাগিয়াছে বাড়িয়াছে। জ্ঞান এবং শক্তি হইতেছে চেতনারই বাহ্য প্রকাশ ও প্রয়োগ। মানুষ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে জগতের সম্বন্ধে—নিজের সম্বন্ধে—নিজেকে নিজে ঘুরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, জগৎকে ছুঁইয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে। চেতনা বাড়িয়া যাইতেছে অর্থ এমন নয় যে, মানুষ নৈতিক হিসাবে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নৈতিক উন্নতি বা স্বভাবের শুদ্ধি হইতেছে চেতনার ঊর্দ্ধমুখী গতি—আমরা এখানে বলিতেছি চেতনার তির্য্যক গতির কথা। মানুষের চেতনা প্রসারিত হইয়াছে—বিস্তৃতির সাথে সাথে তাহা আবার বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে —"চিত্র প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।"[১] প্রসারণ ও সমৃদ্ধির অর্থ সৃষ্টির ভালমন্দ দুই রকম বৃত্তিকেই আলি করা—হয়ত অনেক ক্ষেত্রে ভাল অপেক্ষা বেশির ভাগ মন্দকেই বরণ করা। বাইবেলের মতে, মানুষ ত আগে নিষ্পাপই ছিল, যখন তাহার ছিল শিশুসুলভ সারল্য ও অজ্ঞান ; সয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল সেদিন যেদিন তাহার জাগিল কৌতূহল, সে পাইল জ্ঞানের আস্বাদ।

জ্ঞানের প্রসারণ অর্থে সাধারণতঃ বুঝি নুতন নূতন অনেকানেক বিষয়কে ক্ষেত্রকে বুদ্ধির, প্রত্যয়ের গোচর করিয়া তোলা। এই দিক

১ উষার সাথে সাথে এক জ্ঞান "বহুমুখী ও বিশ্বব্যাপী হইয়া জন্মিল" —ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, সূক্ত ১১৩

দিয়া আধুনিকের জ্ঞানের প্রসার অনেক হইয়াছে, সন্দেহ নাই—অন্ততঃ বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে। জড়-প্রকৃতির নব নব বহুতর রহস্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, এক দিকে অণোরণীয়ান্ বিদ্যুৎকণা অন্যদিকে মহতো মহীয়ান্ জ্যোতিষ্কমণ্ডল, কত রূপ কত গতিবিধি আমরা উদ্ঘাটিত করিয়াছি। প্রাচীনের তুলনায় এই পথে আমরা অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছি। তবে, অন্তরের জগৎ সম্বন্ধে সে কথা কতটুকু বলিতে পারি তাহা বিচার্য্য—ভিতরের চেতনায় নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন তথ্য খুব বেশি যে আমরা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও এক হিসাবে প্রাচীনের সাথে আধুনিকের বিশেষ পার্থক্য ফুটিয়া উঠিতেছে—এবং সেখানেও দেখি ঘটিয়াছে জ্ঞানের প্রসারণ, চেতনার বিস্তৃতি।

আগে মানুষ—যে মানুষ বুদ্ধির স্তরে উঠিয়াছে, শিক্ষায়-দীক্ষায় মার্জিত হইয়াছে সে—তাহার ব্যক্তিরূপ বা আধারকে অর্থাৎ দেহকে প্রাণকে ও মনকে, এবং প্রকৃতির ও এই ত্রিধা ভূমিকে, দেখিত বুঝিত বিষয় হিসাবে। জ্ঞাতার চক্ষে—কর্ত্তার হাতের ত কথাই নাই, সমস্ত সৃষ্টিই ছিল জড়বস্তু। কর্ম্মীর, কাজের কাজীর স্থূল চক্ষুই হোক, দার্শনিকের বুদ্ধি-বিচারের চক্ষুই হোক, কিম্বা যোগীর অন্তরস্থ চৈতন্য-পুরুষের চক্ষুই হোক—যে চক্ষু দিয়াই আমরা জগৎকে এ যাবৎ দেখিয়াছি তাহাতে সর্ব্বত্র বিষয়ের জড়ত্বই ধরিয়া লইয়াছি—দেহের, প্রাণের বা মনের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য চেতনা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সাংখ্যের জবাব ত স্পষ্ট; বেদান্তের সিদ্ধান্তও তদনুরূপ—প্রকৃতি জগৎ জড় অচেতন, অবিদ্যা অজ্ঞান। প্রকাশের মধ্যে—প্রকৃতিতে জগতে, যদি চেতনার আভাস পাই তবে তাহা প্রকৃতির জগতের উপরে অতীতে যে পুরুষ বা ব্রহ্ম তাঁহারই চেতনার সংক্রমণ বা আরোপ বা প্রতিচ্ছায়া। নিজের নিজের রূপে ব্যক্তরূপ সব স্বভাবতই জড় অজ্ঞান—ব্যক্তরূপের গণ্ডী

মুছিয়া ফেলিয়া যতখানি অরূপে তাহারা মিশিয়া যাইতেছে ততখানিই তাহারা হইতেছে চৈতন্যময়—নিজেকে হারাইয়া তবে তাহারা পাইতেছে তাহাদের জ্ঞানময় আদি সত্তা।

আধুনিক চেতনার বৈশিষ্ট্যই এইখানে যে, তাহার কল্যাণে মানুষ আপন ব্যক্ত প্রকৃতিরই মধ্যে, স্থূল রূপায়নকে অক্ষুন্ন রাখিয়া তাহারই মধ্যে সজ্ঞান সচেতন হইয়া উঠিতেছে। মন প্রাণ, এমন কি দেহ পর্য্যন্ত, নিজে নিজের পরিচয় লইতেছে—তাহারা কেবল জড় বিষয় নয়, বিষয়ীর স্বভাবও তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে। আগে বড় জোর মনই ছিল একাধারে বিষয় ও বিষয়ী—মনই দেখিত প্রাণকে দেহকে এবং নিজেকে—মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেঠ্‌ঠা মনোময়া ; কিন্তু এখন মন ত মনকে জানিতেছেই, প্রাণও জানিতেছে প্রাণকে, দেহও জানিতেছে দেহকে—ইহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের চেতনা আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই সম্বুদ্ধ সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আজকালকার বিজ্ঞান জড়ের সম্বন্ধে এই ভাবেই না সত্যের সন্ধান করিতেছে, যাহাতে বস্তু নিজেই নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রহস্য ব্যক্ত করিয়া ধরে? জগদীশচন্দ্রের যাদুবলে গাছপালা আজ নিজেরাই নিজেদের জীবনের গুপ্ত কাহিনী লিখিয়া চলিয়াছে। এ সকল কি ঐ তত্ত্বেরই প্রকাশ বা ইঙ্গিত নয়? প্রাণের ক্ষেত্রেও দেখি, আমরা ঐ একই প্রণালী অনুসরণ করিতে সুরু করিয়াছি। প্রাণকে বুঝা যায় প্রাণ দিয়া, প্রাণকে প্রাণের সহিত একাত্ম করিয়া, প্রাণের চেতনায় জাগিয়া। তাই বের্গসন বলিতেছেন, সাক্ষাৎ অনুভূতি (Intuition) হইতেছে একটা সহ-অনুভূতি (Sympathy)।

মনের ক্ষেত্রেও মন যে রকমে আত্ম-চেতনায় সম্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, আত্ম-ছন্দে আপনাকে চালিত করিতেছে তাহাও দেখাইতেছে আধুনিকের বৈশিষ্ট্য। মন অবশ্য চিরকালই মনকে দেখিতে এবং বুঝিতে অভ্যস্ত—

কিন্তু সে যেন ছিল মনকে মনের বাহিরে স্থাপিত করিয়া, জড়বস্তু হিসাবে দেখিয়া। আজকাল মনের জ্ঞান পাইতেছি মনকে মনের সাথে মিশাইয়া ধরিয়া—এখানেও একাত্মতাই হইয়াছে জ্ঞানের পন্থা। মনের মধ্যে মনোময় পুরুষ তন্ময় হইয়া গিয়াছে—এই এক মানসিক সমাধির সহায়ে আপন অন্তর হইতে উর্ণনাভের মত সে যেন আবিষ্কার করিতেছে, রচনা করিতেছে অনুভূতির প্রতীতির, ভাবের প্রত্যয়ের, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র তথ্যাবলী সূত্রাবলী ; আধুনিক সাহিত্যের ইহা একটি বিশেষ ধারা (Proust, Valéry, Gide, Jean Giraudoux)।

আগের আগের যুগে দেহ মন প্রাণ—মানুষের সমগ্র আধারটি অনেকটা অবুঝের মত, অন্ধের মত, নির্ব্বিচারে একটা আদর্শকে ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইত, মানিয়া চলিত—যুগভেদে দেশভেদে কখন কোথাও তাহা হইয়াছে দেহগত ধর্ম্ম, কখন কোথাও প্রাণগত, আবার কখন কোথাও মনোগত ধর্ম্ম। তখন সতীর যেমন সংস্কার ছিল পতির পদতলে আত্মবলি দিয়াই তাহার সকল সার্থকতা তেমনি মানুষের আধারেও এই শিক্ষা দীক্ষা ছিল, সর্ব্বথা আপনাকে অনুগত করিয়া রাখা। রীতি, নীতি, আচার, ইষ্ট, ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি নানা নামে ও রূপে তাহার প্রভুকে সম্মুখে স্থাপন করা হইত।

কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের আধার, আধারের প্রতি স্তর তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—শ্রীরাধার মত তাহারা তাদের প্রভুকে মুখ ফুটিয়া বলিতেছে

শুন মানব রাধা স্বাধীনা ভেল।

বাহিরের কোন একটা আদর্শ বা ব্যবস্থা তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতিকে আর চাপিয়া বা দাবাইয়া রাখিতে পারিতেছে না অন্য কোথাও হইতে আরোপিত মানদণ্ড অনুসারে তাহারা নিজেকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহিতেছে না। প্রতি অঙ্গ আজকালকার যুগে পাইতেছে এক

স্বাতন্ত্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য, আত্ম-সংস্থা (self-determination)। তাহারা নিজের ভার নিজে গ্রহণ করিতেছে, নিজের পথে নিজের সত্য ও ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া অনুসরণ করিতে চাহিতেছে।

আজকাল সর্ব্বত্র যে একটা স্বেচ্ছাচার, অনাচার, যে নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে তাহার নিদান এইখানে। মানুষের ইতরা বা অপরা প্রকৃতির স্তরে স্তরে একটা আত্মসম্বিতের আলো, স্পন্দন প্রকাশ পাইতেছে। এই আত্মজাগরণের প্রথম ফল হইয়াছে যে পুরাতনের অন্ধ সংস্কারের শৃঙ্খলা টুটিয়া গিয়াছে কিন্তু নূতনের পূর্ণ চেতনার শৃঙ্খলা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্ত্তমান হইতেছে সন্ধিকাল—পরিবর্ত্তনের যুগ—স্থিতির নয়।

মানুষের অঙ্গে অঙ্গে, তাহার সত্তার স্তরে স্তরে এই যে স্বাতন্ত্র্য বা আত্ম-চেতনার সূত্রপাত তাহাকেই পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি চেতনার তির্য্যক গতি বা সম্প্রসারণ। অবশ্য প্রসারণের পশ্চাতে, অন্তরালে আছে হয়ত একটা ঊর্দ্ধ্বলোক হইতে জ্যোতির ক্রমিক অবতরণ এবং ফলে নূতন একটা ঊর্দ্ধ্বায়নের আরোহণের প্রেরণা ; কিন্তু এ সকল প্রচ্ছন্নলোকের শক্তি, আমাদের জাগ্রতচেতনায় তাহা আসিয়া এখনও ধরা দেয় নাই—তাহাতে হয়ত রহিয়াছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ; কিন্তু বর্ত্তমানে রূপায়িত ছন্দায়িত হইয়া উঠিয়াছে চেতনার বহির্ম্মুখী বহুধা গতি।

পূর্ব্বতন যুগে মানুষের মধ্যে একটা অন্তর্ম্মুখী, ঊর্দ্ধ্বমুখী প্রেরণাই হয়ত অধিকতর স্পষ্ট জাগ্রত ছিল ; কিন্তু সে প্রেরণা চলিত সরল রেখায়, একটিমাত্র ধারা অবলম্বন করিয়া। যেমন মনকে আশ্রয় করিয়া কি মানসিক চেতনার একটি সূত্র ধরিয়া উপরে মানসাতীত লোকে মানুষ উঠিয়া যাইত কিম্বা হৃদয়ের মধ্যে নামিয়া তেমনিভাবে ডুবিয়া তলাইয়া যাইত একটি অতীন্দ্রিয় চেতনায়। বর্ত্তমান যুগের মানুষের

পক্ষে এই ধরণের উপলব্ধি তেমন সহজ ও সুলভ নয়; সে ডুবিয়াও যায় না, উপরে উঠিয়াও চলে না সে দেয় আপনাকে সমানভাবে চারিদিকে প্রসারিত করিয়া।

তাই বর্ত্তমান যুগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মানুষ জিনিষকে, নিজেকে কেবল একদিক হইতে নয়—সেদিক যতই উপরের বা গভীরের হৌক না কেন—দেখিতে বুঝিতে চাহে নানা দিক হইতে নানা ভাবে। শুধু নিজের চক্ষু দিয়া নয়, পরের চক্ষু দিয়া, সকলের চক্ষু দিয়া জিনিষ দেখিতে কি রকম তাহাও জানিতে সে চায়। এমন কি, একটির পর আর একটি পর্য্যায়ক্রমে নয়, কিন্তু যুগপৎ সকল দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতেছে। শিল্পে Cubism, Futurism ও Surrcialsm এর উদ্ভব হইয়াছিল এই প্রেরণায়। প্রাচীনের শিল্পের রীতি ছিল এক জিনিষকে এক সময়ে একই স্থান হইতে, একই দৃষ্টি দিয়া দেখা—সে দৃষ্টি স্থূল চক্ষুর হৌক আর অন্তরের অনুভব হৌক। কিন্তু বর্ত্তমানে দৃষ্টির এই একনিষ্ঠা—এই unity of apperception—আমরা বাতিল করিয়া দিয়াছি। দৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছি—জিনিষের বহুধা বিচিত্ররূপ দেখিতে।

সর্ব্বাঙ্গে আত্মচেতনার ফলেই যেন মানুষ এইভাবে আপনাকে কেবল পাশাপাশিই প্রসারিত করিয়া দিয়া চলিয়াছে। তাহার প্রতি অঙ্গ জিনিষকে ধরিতে ছুঁইতে চাহিতেছে আপন আপন ভাবে ভঙ্গীতে—মন চাহিতেছে এক ধারায়, প্রাণ আব এক ধারায়, দেহ তৃতীয় আর এক ধারায়; এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধারাকে চাহিতেছে ঐকান্তিক, আত্যন্তিক ভাবে। আর এইজন্যই পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছে এবং মানুষের মধ্যে দেখা দিয়াছে অরাজকতা বিশৃঙ্খলতা।

চেতনার এই যে বিস্তার, যে বিক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাহা মূলতঃ বৃহতের

দিকে আস্পৃহার ও প্রগতির ফল। কিন্তু সত্যকার বৃহৎ চেতনা মানু-ষের আসিবে তখনই, যখন এই তির্য্যক্ গতির সহিত যোগ করিয়া দিতে পারিবে অথবা এই তির্য্যক্ গতিকে প্রকাশ করিবে, রূপ দিতে থাকিবে একটা ঊর্দ্ধমুখী ও অন্তর্ম্মুখী গতি।

পরিচয়, মাঘ, ১৩৩৮

বিজ্ঞানে ও অধ্যাত্মে

বিজ্ঞানে ও অধ্যাত্মে (অথবা ধর্ম্মে) একরকম চিরদিনই দ্বন্দ্ব চলে এসেছে। বিজ্ঞানের অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের যখন জন্ম হয় নাই তখনও এই দুই পরিবারের মধ্যে বেশি মিল ছিল না। বিজ্ঞান হল মস্তিষ্কের, স্থূল ইন্দ্রিয়ের, বাহ্যবুদ্ধির, বিচার-বিতর্কের ধারায় লব্ধ জ্ঞান; কিন্তু অধ্যাত্ম সত্য অন্য ধরণের বস্তু—নৈষা তর্কেণ মতিরাপণীয়া। তবে শোনা যায় বিজ্ঞানের মতি ইদানীন্তন কালে নাকি ফিরেছে—এমন কি অনেকে বলেন বিজ্ঞানের conversion (সেন্ট পল বা জগাই মাধাইর মত) হয়েছে।

কিন্তু কথাটায় দ্বিধার অবকাশ যে নাই তা বলা যায় না। বিজ্ঞান হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে যতই বিপর্য্যয় ঘটুক না, তার ফলে সে যে আধ্যাত্মিক বা অধ্যাত্মমুখী পর্য্যন্ত হয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া গিয়েছে কি না সন্দেহ। অবশ্য অনেক বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্ম-মুখী বা আধ্যাত্মিকও হয়ে উঠেছেন—কিন্তু সে কি তাঁদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের জোরে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে? পারতপক্ষে বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিকতার দিকে তাঁদের সহজ প্রবণতা ছিল, সেই জিনিষটাই ফুটে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞানের একটা সঙ্কটকালের এবং সেইজন্য একটা অনুকূল অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রসাদে। আসলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর আধ্যাত্মিক বোধ মানুষের দুটি দুদিকের বৃত্তি—উভয়ের কর্ম্ম ও ক্ষেত্র পৃথক; ওরা স্বচ্ছন্দে একই আধারে বসবাস করতে পারে। বৈজ্ঞানিক হলে আধ্যাত্মিক হতে পারা যায় না বা আধ্যাত্মিক হলে যে অবৈজ্ঞানিক হতেই হবে, এমন কোন অনিবার্য্যতা নাই। প্রাচীনতর

কালে অনেক—বোধ হয় বেশির ভাগ—বৈজ্ঞানিকই আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। নিউটন বা কেপলারকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য অবিশ্বাসী বা সংশয়ী হয়ে উঠতে হয় নাই।

বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে যে সংঘর্ষ হয় তার হেতু উভয়ের দিক থেকে একটা অনধিকার-চর্চ্চা—অর্থাৎ বিজ্ঞানে যখন চায় ধর্ম্মের সূত্র বেঁধে দিতে আর আর ধর্ম্ম চায় বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করতে। ধর্ম্ম যখন ফতোয়া জারি করলে সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, পৃথিবী স্থির, এর উল্টো কথা যে বলবে তাকে পুড়িয়ে মারতে হবে, কিম্বা বিজ্ঞান যখন বললে আমাকে অক্সিজেন হাইড্রোজেন দাও, শুধু জল নয় তা দিয়ে আমি ভগবানকে পর্য্যন্ত গড়ে দিতে পারি,—ঘোষণা করলে—ভগবান, আত্মা, চৈতন্য, এসব হল মস্তিষ্কের এক রকম রসস্রাব তখন তারা নিজের নিজের কোট ছেড়ে দিয়ে অপরের এলাকায় প্রবেশ করেছে—ফলে দুজনাই বিপুল গোলমাল সৃষ্টি করে ভ্রমপ্রমাদের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে। তবে আজকাল দেখা যায় ধর্ম্ম আর অতখানি অন্ধ নয়, বিজ্ঞানও অনেক সাবধান হয়ে কথা বলতে শিখেছে।

আমাদের দেশে এক দার্শনিক সিদ্ধান্তে বলে যে প্রকৃতি নিজে জড়, তার মধ্যে যদি কিছু চৈতন্যের আভাস ফুটে ওঠে, তবে তা সংক্রামিত হয়েছে পুরুষ থেকে। এই কথাটি ধরে আস্তিক ও নাস্তিক, অধ্যাত্মবাদী ও জড়বাদীর পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। আস্তিক অধ্যাত্মবাদী হলেন তিনি যিনি পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, আর নাস্তিক জড়বাদী পুরুষে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করেন শুধু প্রকৃতিতে। আস্তিক অধ্যাত্মবাদীর মধ্যে এক শ্রেণীর অতিবাদী আছেন যাঁরা শুধু পুরুষেই বিশ্বাস করেন—নাস্তিক অতিবাদীরা পুরুষকে যেমন বলেন প্রকৃতির বিজৃম্ভণ, এঁরাও তেমনি প্রকৃতিকে মনে করেন পুরুষের দুঃস্বপ্ন—মায়া নু মতিভ্রমো নু।

সে যা হোক—প্রকৃতি দুঃস্বপ্ন আর সুস্বপ্ন অথবা নিরেট বাস্তব হোক—আধ্যাত্মিকতা অর্থ এই উপলব্ধি এই সিদ্ধান্ত যে সেই প্রকৃতির অন্তরালে রয়েছে, এক পুরুষ বা চিন্ময় সত্তা, এই নিভৃত চৈতন্যই আপন তপোবলে (বা মায়াবলে) বিশ্বের প্রতিরূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সে চেতনা মানুষের মানসিক জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়গত প্রত্যয় নয়—ইন্দ্রিয়গত প্রত্যয়, মানসিক জ্ঞান সেই চেতনারই এক একটি সঙ্কীর্ণতর স্থূলতর রূপ বা অভিব্যক্তি। আর সে চেতনার স্বরূপ হল আনন্দময়—সৃষ্টির দুঃখ, কষ্ট বেদনার অন্তরালে রয়েছে সেই আনন্দ, বেদনার বিপরীত দিকেই প্রচ্ছন্ন আছে একটা ভূমৈব সুখং। আরও সে বস্তুটি হল অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত—জরা মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না, তারই মধ্যে এ সকল বৈকল্য গ্রথিত, সূত্রের মধ্যে মণির মত, তারই নাম 'সৎ'। সৎ-চিৎ-আনন্দ, এই ত্রিধা বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধ্যাত্মের স্বরূপ, মূল আদিরূপ। অবশ্য অধ্যাত্মের আরও নানা তত্ত্ব, এমন কি গভীরতর রহস্য আছে, কিন্তু সেগুলিকে ন্যূনতম অবশ্য-প্রয়োজনের পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত না করলেও হয়ত চলে। কিন্তু এই সৎ-চিৎ-আনন্দ হল অধ্যাত্মের অপরিহার্য্য সীমানা। অধ্যাত্ম-রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে এ পর্য্যন্ত অন্ততঃ উঠে আসতে হবে, এই লোকের উপলব্ধি দৃষ্টি লাভ করতে হবে।

সুতরাং যদি বলি বিজ্ঞান প্রায় আধ্যাত্মিক হতে চলেছে, তবে দেখতে হবে, এই দিক দিয়ে সে কতখানি এগিয়েছে—জড়জগতের মধ্যে সচ্চিদানন্দের আভাস কতটুকু কি ভাবে তার দৃষ্টিতে বা সিদ্ধান্তে ধরা পড়েছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগতের স্বরূপটি কি দাঁড়িয়েছে আজ? বস্তু অর্থ সত্তা ও শক্তি। জগতের সত্তা কি, কোন পদার্থে বা উপাদানে গঠিত সে, আর কোন শক্তিতে সে সব পদার্থ কাজ করে চলেছে? বিজ্ঞান বলছে সে দুটি জিনিষ হল ঈথর আর বিদ্যুৎ—ঈথর[১] হল মূল

[১] ঈথর সম্বন্ধে আধুনিকতর সিদ্ধান্তের কথা পরে বলেছি।

সত্তা বা পদার্থ, তার মধ্যে তাকে আশ্রয় করে চলছে বিদ্যুৎ-শক্তির ক্রিয়া ; সৃষ্টিকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান আজ যেখানে এসে ঠেকেছে তা এই। তবে দুটির পরিবর্ত্তে এদের একটিকেই আদি মূল বলে গ্রহণ করা যেতে পারে—হয় ঈথর, কারণ ঈথরেরই একটা পরিণাম, একটা আকুঞ্চন-প্রকুঞ্চন হল বিদ্যুৎ ; আর না হয় বিদ্যুৎ, কারণ বিদ্যুতেরই সাথে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয়—বিদ্যুতের সাম্য অবস্থা বা মূল যে ঈথর তা এখনও অনুমানের জিনিষ, যদিও তার অস্তিত্ব একরকম নিঃসন্দেহ বলেই বোধ হয়। এই ঈথর অব্যয় অক্ষয় শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী সত্তা, আধ্যাত্মিক 'সৎ' বা ব্রহ্মের মতন। এবং এই সৎ-এর যে শক্তি তা মূলতঃ 'তৈজস'—তা অপরিসীম এবং প্রায় অঘটনঘটনপটীয়সী।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই যে সৎ-তেজঃ তাতে চৈতন্যের, 'চিৎ'-এর কি ইঙ্গিত পাই ? আধ্যাত্মিক যে সৎ, বিশ্বের যে মূল সত্তা, তার সমস্ত বিশেষত্বই এই যে সে চিন্ময়। বিজ্ঞান তার জ্ঞানকে যতদূর পারে প্রসারিত করে আজ এইটুকু বলতে পারছে যে বৈদ্যুতিক রেণুগুলির গতিবিধিতে লক্ষ্য হয় একটা আকস্মিকতা, কেমন যেন স্বৈরাচার—জড়ের ধর্ম্ম হল একান্ত নিয়মানুবর্ত্তিতা, ধরা-বাঁধা গতানুগতিকের ধারায় বরাবর চলা, যাকে বলে যন্ত্রের মত চলা ; কিন্তু প্রকৃতির এই যে সব মূল আদি বা আদিম উপাদান তাদেকে যেন দৃঢ় নির্দ্দিষ্ট বিধানের মধ্যে বেঁধে দেওয়া যায় না, সেখানে যে নিয়মের কথা বলি তা হল গড়পড়তার, 'মোটের উপর'কার নিয়ম, সে নিয়মকে ব্যষ্টিরা প্রতিনিয়তই অতিক্রম করে চলেছে। তাদের চলনে রয়েছে যেন স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য ; একাধিক পথ যখন তাদের সম্মুখে ঠিক সামনে উন্মুক্ত, তখন তা থেকে তারা যেন ইচ্ছামত বেছে নেয় একটা পথ। এই রকমে একটা যেন নিভৃত সচেতন ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত দেখা যায় বৈদ্যুৎ-অণুর ক্রিয়াকলাপে। প্রকৃতপক্ষে এটি অনুমান মাত্র এবং কোন বৈজ্ঞানিক যদি অস্বীকার

করেন তবে তাঁকে স্বীকার করাবার উপায় নাই—সাক্ষাৎপ্রমাণাভাবাৎ।

তবে আরও কথা আছে। বিদ্যুৎ না হয় অচেতন জড় হলই কিন্তু জড় ছাড়াও স্বষ্টিতে দেখি আছে আর এক শক্তি প্রাণ, জীবকোষের মধ্যে তা স্পন্দিত। জীবকোষ অর্থাৎ জীবকোষের দেহ জড় উপাদানে গঠিত বটে—কিন্তু তার গতিবিধি, আচার ব্যবহার একান্ত জড়ের মত নয়, জড়ধর্ম্ম ছাড়াও তাতে আছে যাকে বলা হয় জীবধর্ম্ম বা প্রাণধর্ম্ম। এবং প্রাণধর্ম্মের সূত্র সকল যথাযথ জড়ধর্ম্মের সূত্র অনুসারী নয়। আবার জড়স্তর এবং প্রাণস্তর ছাড়াও আর একটি ক্ষেত্র আছে স্বষ্টিতে, যেখানে তৃতীয় একটি ধর্ম্ম দেখা দিয়েছে—তা হল চৈতন্য। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে দেখি এই তিনটি ধারা বা স্তর।

এই হল দৃষ্ট বাস্তব বা ফ্যাক্ট—বৈজ্ঞানিক চক্ষেও ; সমস্যা এখন এই উক্ত ধারাত্রয় বাস্তবে একান্ত পৃথক দেখি না, ওরা রয়েছে একসাথে মিশ্রিত হয়ে, ওতপ্রোতভাবে—ওরা কি তবে একই মূল জিনিষের বিভিন্ন পরিণাম বা অভিব্যক্তি না সম্পূর্ণ আলাদা, আছে কেবল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে? প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির লীলায় কয়েকটি মোটা ও সাধারণ ঐক্য দেখে এবং একটি বিশেষ ক্ষেত্রের কিছু তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করে উৎসাহে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেছিলেন, একং সৎ আর তা হল জড় ; জড়েরই পরিণাম বা রকমফের হল প্রাণ এবং চৈতন্য —আপাততঃ ওরা দেখতে যতই বিভিন্ন ও বিসদৃশ হোক না, আসলে ওদেরকে একই পদার্থে—জড়ে—"সরল" করে ধরা যায়। মাটি থেকে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণী, প্রাণী থেকে মানুষ জন্মেছে (তথ্যটা সাধারণের ভাষায় বলতে গেলে)। কিন্তু বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হতে লাগল ততই দেখতে পেল যে জড় থেকে প্রাণ, তারপর প্রাণ থেকে চেতনা হয়েছে—ব্যাপারটি এই রকম দেখতে বটে কিন্তু জড় যে কখন কি উপায়ে

প্রাণে পরিণত হল বা প্রাণই বা কবে কি ভাবে চেতনায় পরিবর্ত্তিত হল তার হদিস পাওয়া শুধু মুস্কিল নয়, একরকম অসম্ভবই বলে মনে হয়। এই সবই হল প্রকৃতির ক্রম-গতির মধ্যে যাকে বলা হয় missing link, hiatus, saltum, sport ইত্যাদি অর্থাৎ অবোধ্য সমস্যা। কাঁচা বৈজ্ঞানিক উৎসাহে জড়-প্রাণ-চেতনাকে কারণ-কার্য্যের পরম্পরা-ক্রমে সাজিয়ে ধরতে পারে বটে, কিন্তু পাকা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি শুধু এইটুকু বলবে যে জড়ের পরে প্রাণ এসেছে, প্রাণের পরে চেতনা এসেছে—post hoc, (এর পরে) কিন্তু তা বলে propter hoc (এর কারণে) কি না নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। জড়ের পরে প্রাণ এল কোথা হতে—জড়েরই পরিণতি তা, না জড়ের মধ্যে পূর্ব্ব হতেই ছিল তা গুপ্ত ? প্রাণ থেকে যে চৈতন্য উদ্ভূত হল তাও কি আগে প্রাণেরই মধ্যে সুপ্ত ছিল ? পরে যা যা এসেছে তা যত ভিন্ন ধর্ম্মের হোক না পূর্ব্বতনেরই মধ্যে নিশ্চয় ছিল অন্তর্লীন, বীজের ভ্রূণের অবস্থায়—কিছু-না থেকে ত আর কিছু হতে পারে না, Ex nihilo nihil, নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ।

এই দিক দিয়ে আজকালকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার চলেছে একটি প্রধান ধারা। জড়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রাণহীনেরও মধ্যে আমরা আবিষ্কার করতে সুরু করেছি প্রাণের খেলা—প্রাণের অর্থাৎ অচেতনেরও মধ্যে চৈতন্যের খেলা। অবশ্য জড়ের মধ্যে প্রাণের যে পরিচয় পাই তা প্রাণের খুব মোটা আদিম অস্ফুট ধারা—সেই রকম প্রাণের মধ্যে যে চৈতন্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাও চেতনার অত্যন্ত স্থূল প্রাথমিক অবস্থা। আর এইজন্য অনেক বৈজ্ঞানিকেরও এখন সন্দেহ রয়ে গিয়েছে যে জড়ের মধ্যে বাস্তবিকই প্রাণ এবং প্রাণের মধ্যে বাস্তবিকই চৈতন্য আছে কি না।

এ কথা যদি সত্যসত্যই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায় যে জড়ে

প্রাণ আছে এবং প্রাণে চৈতন্য আছে—তা হলে এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় যে জড়ে আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছে চৈতন্য, যদিও অপ্রকট অন্তর্লীন চেতনা ; জড়ের আদি অণু—বিদ্যুৎ-কণাদের আচার-ব্যবহারে এইজন্যই কি চেতন-বৎ কিছুর আভাস আমরা পাই নাই ?

সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র রয়েছে একটা নিভৃত চৈতন্য—আধুনিক বিজ্ঞানের মুখ দিয়ে এ পর্য্যন্ত স্বীকার করান যেতে পারে, হয়ত একটু জোরজবরদস্তি করে। কিন্তু তবুও এ চেতনা অধ্যাত্ম-চেতনা হল না ; কারণ অধ্যাত্ম-দৃষ্টি যে চেতনাকে দেখে তা অপরিণত অপরিস্ফুট নয়, তা পূর্ণ পরিণত, মানব মানস-চেতনা অপেক্ষাও বেশি জাগ্রত, এবং সে চেতনা প্রকৃতির একটা গৌণ অঙ্গ বা আশে-পাশের ব্যাপার নয়, তাই হল মুখ্য কেন্দ্রগত সত্য—সেই চেতনাই কেবল রয়েছে, আর সব—প্রাণ ও জড়—তারই তরলিত বা ঘনীকৃত রূপায়ণ। তবে বলা যেতে পারে, বৈজ্ঞানিকও এই চেতনাকেই দেখছেন, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে, বাহির থেকে উপর-উপর থেকে, অন্তর থেকে গভীর থেকে নয়—যেন দূরবীক্ষণের উল্টা দিক দিয়ে, তাই বৃহৎকে ও-রকম অণুবৎ সে দেখছে।

তা ছাড়া, এক বিশেষ রকমের আস্তিকতাকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি জন্ম দিয়েছে দেখি। প্রাণ ও চেতনা জড়ের মধ্যে সম্পুটিত ছিল—ক্রমে তারা বিবর্ত্তনের ধারায় প্রকটিত হয়ে এসেছে ; সেই রকম ভগবান বা ভাগবত সত্তাও প্রথম ছিল না অর্থাৎ ছিল গুপ্ত লুপ্ত অবস্থায়, ক্রমে কালস্রোতে তিনিও বিবর্ত্তিত বিকশিত হয়ে চলেছেন। সৃষ্টি, মানব-জীবন যখন পূর্ণতা সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য অধিগত করবে, ভগবানও তখনি সত্য সত্য ভগবান হয়ে উঠবেন।

বিজ্ঞানপন্থীর এই সিদ্ধান্ত বা অনুভূতি হয়ত একটু কিম্ভূতকিমাকার বলে বোধ হয় ; তার কারণ, আমরা প্রাচীনের নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তিমুখী আধ্যাত্মিকতায় অভ্যস্ত—কিন্তু এটিকে এক নব অভিনব

অধ্যাত্মসিদ্ধির অঙ্গ করে তোলা যেতে পারে যা হবে সক্রিয়,—স্থিতিমুখী নয়, যা হবে গতিমুখী। উর্দ্ধে বা গভীরে, পশ্চাতে বা অন্তরালে যে ভগবান বা অধ্যাত্মসত্তা রয়েছে—যাকে না ধরতে ছুঁতে পেয়ে বিজ্ঞান বলে উঠেছে, Verily thou art a God that hidest thyself—তা পূর্ণ, নিত্যসিদ্ধ, চিরবর্ত্তমান, আপূর্য্যমান ও অচল-প্রতিষ্ঠ। আমরা ইচ্ছা করলেই—এবং এযাবৎ তাই করে এসেছি—সৃষ্টিকে জগৎকে জীবনকে ছেড়ে দিয়ে প্রত্যাহারের, নিবর্ত্তনের পথ ধরে তার মধ্যে লীন হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এ ুগের আধ্যাত্মিক বার্ত্তা এই যে, ভগবান কেবল ওপারে নয়, তিনি রয়েছেন এপারেও, আবার তিনি কেবল বর্ত্তমানও নন, তিনি ক্রিয়মান এবং শুধু ক্রিয়মান নন বিবর্ত্তমান ও বিবর্দ্ধমান; ভগবান তাঁর সৃষ্টির মধ্যে, মাটির মধ্যে পর্য্যন্ত নেমে এসেছেন, নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন, আবার সেখানেই ক্রমে ব্যক্ত করে রূপায়িত করে তুলছেন তাঁর স্বরূপকে পরাপ্রকৃতিকে —অন্য লোকে নিত্যসিদ্ধ যা সেই বস্তুই ইহলোকে এক সাধনার ক্রম আশ্রয় করে নবসিদ্ধির অভিমুখে চলেছে। পরমার্থকে কেবল পার-মার্থিক করে না রেখে, তাকে ব্যবহারিক করে তোলবার এই যে প্রকৃতির প্রচেষ্টা বা সাধনা, বিজ্ঞানের দৃষ্টি তাই কথঞ্চিৎ আবিষ্কার করছে এবং তার ক্ষুদ্র হাত তাতে যথাসাধ্য সাহায্য করছে বলে মনে হয়।

তবে অধ্যাত্মের যে আনন্দময় রহস্য—যা বোধ হয় তার উত্তম রহস্য —সে দিক দিয়ে বিজ্ঞান আদৌ অগ্রসর হয় নাই। তার কারণ এটি হল হৃদয়ের পথ—রূঢ় সত্য ও-বৃত্তি দিয়ে আবিষ্কার হয় না, বিজ্ঞানের বিশ্বাস; বিজ্ঞানের আশঙ্কা ও-পথে ভুলভ্রান্তি মায়ামোহ অতি সুলভ ও প্রচুর—বিজ্ঞানের হল তাই মস্তিষ্কের পথ। কিন্তু কেবল আনন্দের উৎস বলে নয়, হৃদয়ও যে সত্যেরই দিব্যদ্বার, সে নিগূঢ় তথ্য বৈজ্ঞানিক চেতনার বহির্ভূত। হৃদয়ের পথে নানা অবান্তর জলজঞ্জাল প্রতিনিয়তই

জুটে এসে সত্যের প্রতিবন্ধক, আবরণ হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু মস্তিষ্কের পথই কি এত পরিষ্কার ভেজালশূন্য—সত্যের জন্য সোদকেও কি কম সতর্ক সজাগ হয়ে চলতে হয়? ফলতঃ পূর্ণ সত্যের জন্য এ দুটি পথই প্রয়োজন—মস্তিষ্কের ধারায় আমরা চলি, উর্দ্ধতর বৃহত্তর সত্যের দিকে আর হৃদয়ের ধারায় চলি গভীরতর তীব্রতর সত্যের দিকে—এবং একটি জায়গায় গিয়ে দুটি ধারাই সম্মিলিত হয়েছে। এক অধ্যাত্ম-সাধনায় উভয়েই পূর্ণতা লাভ করেছে। বিজ্ঞানে আছে তার একটি নিয়ে—সেই পথে যতটুকু যে ভাবে হোক সে যদি কিছু অভিনব সমৃদ্ধি অভূত-পূর্ব্ব সম্ভাবনার সূচনা করে থাকে তবে তার অস্তিত্ব সার্থক।

জয়শ্রী, ১৩৪১

নব্যবিজ্ঞান

বিজ্ঞানের চোখে জগৎটা আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠে নাই—নিশ্চয়; কিন্তু যা হয়ে উঠেছে বা হযে উঠতে চলেছে, তা দেখে সে নিজেই যে অনেকখানি বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ছে তাতে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানের যখন জয়জয়কার, সত্যের সম্বন্ধে যখন তার দ্বিধা সঙ্কোচ বিশেষ কিছু ছিল না, তখন জগৎটাকে সে মনে করত বা দেখত হস্তামলকবৎ, অর্থাৎ জগৎ হল শক্ত নিরেট বস্তু দিয়ে গড়া আর সে বস্তুর রীতিমত স্থির নিশ্চিত—অব্যাভিচারী—আয়তন আছে, ভার আছে, ওজন আছে, গতি ও স্থিতি আছে। নিউটন জগতের এই ছবিখানি এমন স্পষ্ট, প্রমাণপ্রতিষ্ঠ করে ধরেছিলেন যে মনে হত এর মেয়াদ শাশ্বত —যাবচচন্দ্রদিবাকরৌ—তাতে কোন সন্দেহ ওঠে নাই। জগতের বস্তুগত উপাদান বিশ্লেষণ করতে করতে পরমাণু (atom) পৌঁছা পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি অটুট ছিল।

কিন্তু তারপরেই গোলমালের সূত্রপাত। পরমাণুর ভিতর দিয়ে যখন পড়লাম গিয়ে বিদ্যুতিনের রাজ্যে, তখন হয়ে গেল একটা ইন্দ্রজাল —জগতের আকৃতিতে একটা আমূল পরিবর্ত্তন, রূপান্তর। দেখা গেল কঠিন কঠোর পদার্থ বলে কিছু নাই—যাকে চোখে দেখি বা স্পর্শে অনুভব করি নিরেট বস্তু বলে, তা আসলে শক্তিপ্রবাহের আবর্ত্ত মাত্র। পদার্থের গুরুত্ব (mass) আগে যে একটা স্থিরনির্দ্দিষ্ট গুণ ছিল, এখন দেখি সে গুরুত্ব গতির একটা অবস্থা বা মাত্রা। গতিবেগের সাথে সাথে গুরুত্ব বাড়ে কমে। আগে পদার্থের একটা অভ্রান্ত লক্ষণই ছিল এই যে, দুটি পদার্থ একই সময়ে একই স্থানে যুগপৎ অবস্থান করতে

পারে না—কারণ জড় হল অভেদ্য (impenetrable)। কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানে বলছে জড়পদার্থের যে আদি মৌলিক রূপ বিদ্যুতিন—বিদ্যু-তরঙ্গ, তাদের দুটি এক সময়ে একই স্থান অধিকার করে থাকতে পারে, তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য না হারিয়ে। সুতরাং বিশ্ব হল বিপুল গতিবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান তড়িৎতরঙ্গমালার সমাহার। আর তড়িতের পরিচয় প্রকাশ বা রূপ হল আলো, জ্যোতি। জগৎ তবে আলোয় আলোময়—জগৎ সত্য-সত্যই জ্যোতিষ্ক, জগৎ জড় দিয়ে নয়, জ্যোতি দিয়ে গড়া। মোটা চোখে যাকে দেখি জড়, বৈজ্ঞানিকের চোখে তাই জ্যোতি। আমরা তবে বিজ্ঞানকে ধরে উপনিষদের কাছে গিয়ে কি পড়ি নাই ?—

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

এ হল জগতের মূল সত্তা, তার বৈজ্ঞানিক স্বরূপ—তার বৈজ্ঞানিক স্বভাবও তেমনি বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। স্বভাব অর্থ চলন, ধর্ম্ম, কর্ম্মের ধারা। বিজ্ঞান নামে জিনিষটি যে আদৌ সম্ভব হয়েছে তার হেতু বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করেছে প্রকৃতির আদি সর্ব্ব-সাধারণ ধর্ম্ম—কারণ-কার্য্যপরম্পরা। এই নিয়ম বা বিধানটির অর্থ কি ? প্রথমতঃ, প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি বস্তু বা ক্রিয়া হতে আর একটি বস্তু বা ক্রিয়া, একটির পরে আর একটি আবির্ভূত হয়ে চলেছে; দ্বিতীয়তঃ, এই যে পূর্ব্বাপরতা, তা হল মূলতঃ একটি বিশেষ হতে আর একটি বিশেষে, একটি ব্যষ্টি হতে আর একটি ব্যষ্টিতে পরিণতি; তৃতীয়তঃ, এই যে একটি জিনিষের আর একটিতে পরিণতি এই প্রক্রিয়ায় কোন উপকরণ ধ্বংস বা লোপ পায় না, সৃষ্টিও হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, কোন প্রক্রিয়ায় কারণ ও কার্য্যের যোগফল সর্বদা এক, অপরিবর্ত্তনীয়। প্রকৃতির ধারায় স্থিরতা, অপরি-বর্ত্তনীয়তার জন্যই প্রকৃতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী অব্যর্থভাবে

করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ব্বপক্ষ যেখানে স্থির, উত্তরপক্ষও সেখানে স্থির হয়েছে—যেখানে যেখানে পূর্ব্বপক্ষ এক, সেখানে সেখানে উত্তরপক্ষও এক। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে কার্য্যকারণের ধারাবাহিকতা। বহুল কার্য্যকারণপারস্পর্য্যের যে সমষ্টি তারই নাম প্রকৃতি। এক বিশেষ বস্তু বা ঘটনা থেকে আর এক বিশেষ বস্তু বা ঘটনা—এই বাঁধাধরা শৃঙ্খলা বৈজ্ঞানিককে কখন নিরাশ করে নাই। শিকলের আংটার মত পূর্ব্বপর ঘটনা বা বস্তুকে ধরে ধরে বৈজ্ঞানিক যেন পাকা রাস্তায় নিঃসন্দেহে চলাফেরা করেন অতীত থেকে ভবিষ্যতে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ওপারে পর্য্যন্ত।

সারা প্রকৃতি একটা বদ্ধঘের (closed circle)—এর মধ্যে আকস্মিক অঘটন, অনিশ্চয় কিছু নাই। যাবতীয় বস্তু ও ঘটনাবলী একটা অমোঘ ক্রম, অলঙ্ঘ্য নিয়তির মধ্যে স্থিরীকৃত, পূর্ব্বনির্দিষ্ট—এতখানি পূর্ব্বনির্দিষ্ট যে সকল পূর্ব্বপক্ষ যদি জানা থাকে তবে সকল উত্তরপক্ষও নিঃসন্দেহে জানা যায়। এইরকম দৃঢ়বদ্ধ যুক্তিগত অন্বীক্ষার—ব্যকলনের—জোরেই নেপচুনের অস্তিত্ব এবং অনেক নূতন মূলপদার্থের অস্তিত্ব—ওদের আবিষ্কারের পূর্ব্বে—বিজ্ঞানে গুনে বলে দিয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ বা ধূমকেতুর আবির্ভাব নির্দ্ধারণ করা ত বিজ্ঞানের অ আ ক খ।

নব্যবিজ্ঞান পুরাতন বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ—আমাদের সহজজ্ঞানেরও প্রত্যক্ষীভূত—প্রকৃতির মধ্যে এই যে পৌর্ব্বাপর্য্য—এই বনিয়াদটি ধরেই টান দিয়েছে; কারণ-কার্য্য-সম্বন্ধটি অলীক হয়ে গিয়েছে। জগতে কোন জিনিষটা যে আগে কোন জিনিষটা যে পরে দেখি, তা বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য বা অনন্যসম্বন্ধ নয়—ও-সত্য ও-সম্বন্ধ নির্ভর করে দ্রষ্টার উপরে, দ্রষ্টা যে পরিস্থিতিতে রয়েছে তার উপর। অন্য দ্রষ্টার চোখে অন্য পরিস্থিতি হতে যাকে তুমি পূর্ব্বে বলছ তাকে পর

দেখাবে, এবং যাকে পর বলছ তাকে পূর্ব্ব দেখাবে ! এরই নাম আপেক্ষিকত্ব (রেলেটিভিটি)। আমি তোমাকে ঘুষি মারলাম, তুমি পড়ে গেলে মাটিতে—একটি কারণ আর একটি কার্য্য তুমি বলবে, কারণ আগে তারপর কার্য্য। কিন্তু একজন দ্রষ্টা যদি থাকে যিনি চলছেন আলোর বেগের চাইতেও বেশী বেগে, তিনি দেখবেন কি ? অনুমান করতে পার ? তিনি দেখবেন তুমি মাটিতে পড়ে আছ, উঠলে আস্তে আস্তে এবং ঠেকালে তোমার গা আমার মুষ্টির সাথে আর শেষে আমার হাত প্রসারিত হল ! ফরাসী এক গল্প আছে, একজন একখানি উপন্যাস পড়তে স্থরু করলে—দেখলে নায়ক মৃত, ক্রমে সে বাঁচল, বৃদ্ধ ছিল যুবা হতে চলল, বালক হল, শিশু হল, শেষে গিয়ে মায়ের পেটে ঢুকল—কল্পনার কি অপূর্ব্ব বামাগতি, বিপরীত-রতি। অবশ্য প্রহেলিকাটির রহস্য এই যে ভদ্রলোক একটি আরবী উপন্যাস পড়ছিলেন—কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন আরবীতে বইএর আরম্ভ শেষ দিক দিয়ে (আমরা যাকে শেষ বলি)। যা হোক, নব্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি এই রকম হয়ে গিয়েছে। তুমি তোমার ছাতাটা আকাশে ছুঁড়ে দিলে—ছাতাটা উপরে চলে গেল ; তুমি বলতে পার এ কথা—কিন্তু আবার এও বলতে পার পৃথিবীটা সরে গেল, ছাতাটা ঠিকই আছে। গাড়ী ছুটে চলেছে, মাটি স্থির অথবা মাটি ছুটে চলেছে, গাড়ী স্থির—এ দুই-ই সত্য, একই ঘটনার দুটি বিভিন্ন দ্রষ্টার দৃষ্টিমাত্র। দৃঢ় গাঢ় নিরেট সৃষ্টি কি রকম তরল শিথিল না হয়ে উঠেছে !

অত গোড়া ধরে টান না দিয়ে আরও অন্যভাবে দেখা যাক জিনিষটিকে। পৌর্ব্বাপর্য্য মেনেই নিলাম, তা হলেও বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-অবস্থা থেকে পরের অবস্থা যথাযথ নির্দ্ধারণ করা আর তেমন সুলভ নয়। নিউটনীয় বিজ্ঞানের সমস্ত জোরই ছিল এই তথ্যটি যে, কোন জিনিষের স্থিতিস্থান ও গতিবেগ যুগপৎ জানা যায়, জানা যায় বলেই কোন মহূর্ত্তে

সে কোন স্থানে থাকবে তা হুবহু নির্দেশ করা যায়। পদার্থবিদ্যা যে এক হিসাবে পুঙ্খানপুঙ্খ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপের বিদ্যা তার প্রতিষ্ঠা গতিতত্ত্বের এই মোটা তথ্যটি। সঠিক নিঃসন্দেহ সুস্পষ্ট মাপজোখ গোনাগুন্‌তি ছাড়া পদার্থবিদ্যা নাই। এ কথাটি সত্য ছিল নিউটনের জগতে অর্থাৎ বড় বড় (অপেক্ষাকৃত, তড়িৎতরঙ্গের তুলনায়) পিণ্ডের কারবারে; কিন্তু পরমাণুর মধ্যে, বিদ্যুৎকণার মধ্যে যখন নেমে গিয়েছি তখন ও-সত্য আর সত্য নয়। নিউটনীয় শাস্ত্র অনুসারে কোন ব্যষ্টির —পিণ্ডের—স্থিতিস্থান জানা থাকলে, তবে তার গতিবেগ সহজেই নির্ণয় করতে পারি—স্থানটি যত সঠিক হবে, গতিবেগও হবে তত সঠিক। স্থানের গণনায় যতখানি অনিশ্চয়তা অসম্পূর্ণতা থাকবে গতির গণনাতেও ঠিক ততখানি অনিশ্চয়তা অসম্পূর্ণতা দে । দিবে। সেই রকমই গতিবেগের নিশ্চিতজ্ঞানেব উপর নির্ভর করে স্থিতিস্থানের নিশ্চিতজ্ঞান। বিদ্যুৎকণার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বড় অদ্ভুত। স্থান যত স্পষ্ট সঠিক জানবে, গতি তত অস্পষ্ট বেঠিক হয়ে পড়বে; আবার গতিকে যত ·পষ্ট সঠিক জানবে, স্থান তত অস্পষ্ট বেঠিক হয়ে পড়বে। স্থানের ও গতির নিরূপণ উভয়তঃ সমানভাবে যত যথেষ্ট অস্পষ্ট অনিশ্চিত রাখ তবেই তোমার ভুলের মাত্রা তত কম হবে। ফলতঃ বিদ্যুৎকণার গতি বা স্থিতি এখন আর গণনার বিষয় নয়—কারণ সঠিক গণনা করা যায় না—বিদ্যুৎকণার (বা তরঙ্গের) গণনা করা হয় ও যায় তার স্পন্দনপরিমাণ (frequency)। অর্থাৎ এখন আর তুমি বলতে পার না তোমার গৃহিণী কটার সময় কোন স্থানে থাকেন—তুমি শুধু জান সমস্ত দিনে কতবার তোমার সাথে তাঁর দেখা হয়! এরকম সংসার আর ওরকম জগৎ—দুই-ই যথেষ্ট সন্দেহাবৃত ঘোরালো নয় কি?

নিউটনীয় জগতের প্রতিষ্ঠা ছিল ব্যষ্টি। প্রত্যেক ব্যষ্টির যে

শক্তি (যে ধরণেরই হোক না) তা মাপাজোখা যেত সঠিক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এবং এই সকল ব্যষ্টিগত শক্তিরাজি পরস্পরের পরস্পরের উপর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াও মাপা চলত হুবহু—এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মোট ফল যা তাও নির্দ্ধারণ করা যেত নির্ভুলভাবে, আর তাই হল জগতের অর্থাৎ প্রকৃতির চলনের চিত্র। এখন আর ব্যষ্টিকে নিয়ে কাজ চলে না—কারণ যে রকম ব্যষ্টির সন্ধান নব্য বিজ্ঞান দিতেছে তা ধরাছোঁয়ার—এমন কি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ধরাছোঁয়ার বহির্ভুত, তা অনুমানের জিনিষ। এক একটি আলাদা ইলেকট্রণ কোথাও কোনরকমে বৈজ্ঞানিকের হস্তগত হয় নাই—ইলেকট্র সমষ্টির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়। ইলেকট্রণ আকারে অতি সূক্ষ্ম বস্তু, এইজন্যই যে তার সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় অসম্ভব এমন নয়। আসল কারণ, ওর গতিবিধিতে স্থিরতা কিছু নাই—কোনটা কখন কোন কক্ষায়, কি গতিতে চলবে তা একেবারে অনির্দ্দেশ্য অনিশ্চিত। ব্যষ্টি নিরঙ্কুশ—তার নিয়ম নাই; নিয়ম হল ব্যষ্টির সমবায়ে—অন্য কথায়, প্রকৃতির নিয়ম হল "মোটের উপর"কার, গড়পড়তার নিয়ম। নিউটনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থ ছিল যা প্রত্যেক ব্যষ্টির পক্ষে অলঙ্ঘনীয়, অবশ্যপালনীয়—নব্য বিজ্ঞানের নিয়ম অর্থ যা অনেকে মোটের উপর মেনে চলে। রশ্মিবিচ্ছুরক (radio-active) বস্তু থেকে বিদ্যুৎকণা ঠিকরে বাইরে ছুটে পড়ছে; কিন্তু শত সহস্র গবেষণা—পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণা—সত্বেও নির্ণয় করা যাবে না কোনটি পড়বে আর কোনটি পড়বে না, একটি কণা শত বৎসর ধরে ভিতরে থাকতে পারে কিংবা মুহূর্ত্তেই বাহিরে ছুটে যেতে পারে। এদিক দিয়ে স্থিরতা নাই। তবে স্থির করে বলা যায় এই যে, একটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে—বিভিন্ন মূলবস্তুর আছে এই রকম বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট কাল—এতগুলি বিদ্যুৎকণা ছুটে পড়বে। কোন উকীল বা ব্যারিষ্টার বা ব্যবসাদারের প্রতিদিনকার আয় যেমন স্থির নাই, তবে মোটের উপর

মাসিক আয় যেমন স্থির থাকে, সেই রকম। পাশার দানের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় এই—বিজ্ঞান আর যান্ত্রিক (mechanistic) নয় ; মোটের উপর একটা যান্ত্রিক-বিধি রয়েছে বটে, ভিতরটা কিন্তু কেমন ফাঁকা, সেখানে রয়েছে অনিয়ম অনিশ্চয়তা। বহু অনিশ্চয়তা মিলে একটা আপাতপ্রতীয়মান নিশ্চয়তা দিয়েছে। এ ধরণের নিশ্চয়তার কাজ চলে যায়—বৈজ্ঞানিকের কাজও চলে যায়। কিন্তু হঠাৎ এ নিশ্চয়তা যদি ভেঙ্গে যায়, তবে আশ্চর্য্য হওয়া চলবে না, তাকে অবৈজ্ঞানিক—unscientific—বলে আপত্তি করা চলবে না। এ রকম পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকা, সে রকম পরিণামকেও বৈজ্ঞানিক বিধির অন্তর্ভুক্ত করে রাখাই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয়। পদার্থের বা শক্তির একান্ত বিনাশ নাই—আগে বলা হত। এখন বলা হতেছে, বিনাশ হয়। পদার্থের ও শক্তির নবসৃষ্টি নাই—এ প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সত্যটির উপরেও বৈজ্ঞানিক সন্দেহের ছায়া পড়েছে।

বৈজ্ঞানিক নিয়ম অর্থই এই—অনেকগুলি উদাহরণ থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কিন্তু অনেকগুলি অর্থ সবগুলি নয়। যে উদাহরণগুলি এযাবৎ দেখেছি তা আমার নিয়মকে সমর্থন করে বটে—কিন্তু যেটি দেখি নাই ঠিক সেটিই হঠাৎ এসে পড়ে আমার নিয়মকে পর্য্যুদস্ত করে দিতে পারে না, এর গারান্‌টি কোথায় ? বিজ্ঞান নিঃসন্দেহ সত্যকে পায় না—পায় একটা সম্ভাব্যতা, বড় জোর, বিশেষ সম্ভাব্যতা (high probability)। পৃথিবীটি ঘুরছে সূর্য্যের চারদিকে—সূর্য্য স্থির মাঝখানে, এই যে নিয়ম তুমি আজকাল করেছ এটিকে প্রকৃতির নিজস্ব অকাট্য নিয়ম বলা যায় না। এটি হল তোমার পর্য্যবেক্ষিত যত ঘটনা তাদের সাধারণ গ. সা. গু. (G.C.M.) সূত্র। এতে তোমার কাজের, তোমার গণনার সুবিধা হয় বটে—কিন্তু এর

বাস্তব অস্তিত্ব এবং চিরন্তন সত্যতা সম্বন্ধে তুমি কিছুই বলতে পার না। সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মই মূলতঃ দ্রষ্টার দৃষ্টিসাপেক্ষ (subjective) এবং দেশকালপাত্রে সীমাবদ্ধ (contingent)। আইনষ্টাইনের সমস্ত চেষ্টাই হয়েছে, বৈজ্ঞানিক নিয়মের এই যে সহজাত দোষ—তার subjectivity ও contingency—তা থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করে দিয়ে দ্রষ্টানিরপেক্ষ বৃহত্তম সত্য আবিষ্কার করা। কিন্তু তাঁরও সত্য গাণিতিক সূত্র মাত্র। এবং তিনিও শেষ কথা বলেন নাই।

যাহোক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ছেড়ে আবার তার বস্তুতে ফিরে আসা যাক। "মোটের উপর"কার বা গড়পড়তার যে নিয়মের কথা বলেছি তা হল সমবায়ের বা সংহতির নিয়ম। আগে ব্যষ্টিকে দিয়ে ব্যষ্টিসকলের যোগফল দিয়ে সমষ্টির পরিচয় হত। কিন্তু এখন ধারাটি উল্টে গিয়েছে। এখন সমষ্টিকে দিয়ে, সমষ্টিকে ধরে তবে ব্যষ্টির পরিচয় গ্রহণ করা হয়। এবং তাতে ব্যষ্টির সম্যক পরিচয় যদি কোথাও নাও হয়, তাতে কিছু এসে যায় না। ব্যষ্টিরা সমষ্টিকে যন্ত্রবৎ নিয়ন্ত্রিত করে না বা গড়ে তোলে না—সমষ্টির আছে একটা পৃথক নিজস্ব ধর্ম্ম, তাইই তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যষ্টির ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। পদার্থবিজ্ঞানে এটি হল প্রাণবিজ্ঞানের একটা ক্রম-স্পষ্টতর সত্যের প্রতিচ্ছায়া। "সাকল্য তত্ত্ব" (Holism) বলছে জীবের যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বা বিশেষ বিশেষ বৃত্তি তা জন্মে গড়ে বাড়ে সমগ্র আধারটির, দেহাধিষ্ঠিত মোট প্রাণশক্তির প্রয়োজনের প্রেরণায়। গোঁড়া ডারউইন সম্প্রদায়ের যে মত ছিল জীবের প্রত্যেক অঙ্গ উদ্ভূত হয়েছে সেই সেই অঙ্গের আপন পৃথক প্রয়োজন ও পরিচর্চ্চার ফলে, আজকাল আর তা নিশ্চয় করে বলা চলে না। পরিচালনার বা প্রয়োজনের পূর্ব্বেই যে অঙ্গের বিকাশ বা প্রকাশ হতে পারে পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতা বা কোনরকম অভিজ্ঞতার পূর্ব্বেই যে বৃত্তির আবির্ভাব হয়, তার উদাহরণ জীবজগতে বিরল নয়। বর্ত্তমানে তাই

জোর দেওয়া হয় এবং গোড়ায় স্বীকার করা হয় সমগ্রের, সমষ্টির, অখণ্ড অস্তিত্ব—জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গৌণ ফল, মুখ্য কারণ জীবের সমগ্র আধারের জীবন্ত সত্ত্ব। মনোবিজ্ঞানেও তাই দেখা দিয়েছে Gestalt তত্ত্ব—রাষ্ট্র ও সমাজ ঐ একই ভাবে প্রণোদিত হয়ে Totalitarian রূপ নিয়ে চলেছে।

আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যায়। বিজ্ঞানে যে আগে উদ্দেশ্যের মৎলবের কথাকে অবজ্ঞা করত—বলত, ওটি অবৈজ্ঞানিক বস্তু বা বৃত্তি। জড় জগতের শক্তির খেলায় উদ্দেশ্যমূলক, লক্ষ্যমুখী গতি (purposiveness) নাই—teleology হল theology-র অঙ্গ, বিজ্ঞানের নয়। জীবজগতের প্রাণ-শক্তির purposiveness আজকাল অস্বীকার করবার উপায় আছে কি না সন্দেহ—অন্ততপক্ষে, এভাবে প্রাণশক্তির ক্রিয়াদি যত সহজে ব্যাখ্যাত বোধগম্য হয়, অন্যপক্ষে কেবল যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় আসে তত কষ্টকল্পনা। তবে কেবল জড়ের ক্ষেত্রে, পদার্থবিদ্যার রাজ্যে, তড়িৎ-অণুর গতিবিধিতে পূর্ব্বকল্পিত উদ্দেশ্য আবিষ্কার কিছু কঠিন। এখানে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা দিয়ে বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা যত সুষ্ঠু হবে মনে হয় তার চেয়ে সুষ্ঠু ও সহজ হবে অতীতে যা ঘটেছে তা দিয়ে বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা। তবুও এখানে কতকগুলি জিনিষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Purpose যদি নাই থাকে, তবুও design-এর অস্তিত্ব বহুদিনেরই জানা কথা। দানা-বাঁধায় (crystallisation) যে নির্ভুল সমভঙ্গ জ্যামিতিক রূপ সব সৃষ্ট হয় তা বৈজ্ঞানিকের চোখেও বিস্ময়কর। মূলবস্তুদের যে পৌনঃপুনিক নিয়ম (Periodic Law) তাতে দেখি কতখানি মাত্রাবদ্ধ সুষীমতা। আর আজকাল বিদ্যুতিনের ক্ষেত্রে সংখ্যার অনুপাতের যে অপরূপ ছন্দ-পারম্পর্য্য প্যাটার্ণ লক্ষ্য করি তাতে প্রাচীন গ্রীকঋষি পিথাগোরার মত সংখ্যাকে জীবন্ত সচেতন জিনিষ বলেই মানতে ইচ্ছা হয়।

বিজ্ঞানে অবশ্য এসব জিনিষের দেখে কেবল বাহ্য বিন্যাস—গঠন রূপবন্ধ—technique। বৈয়াকরণিক দেখেন যেমন কেবল ভাষার গঠন—করেন পদবিশ্লেষণ, অথবা ছান্দসিক কবিতার দেখেন যেমন কেবল তালমান কিন্তু লেখকের কবির চেতনা অনুভব তাঁদের বিচারের বা পরিচয়ের বাহিরে, তেমনি বিজ্ঞানেও জড়কণার গতিবিধিতে যে সুচারুতা বা সৌষীম্য তার বিশ্লেষণ করে বটে কিন্তু তার উৎসের, উৎপত্তির দিকে দৃষ্টি দেয় না। বিজ্ঞানে উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যকে নিয়ে কারবার করে না, তার কারবার হল কারণকে নিয়ে। উদ্দেশ্যের লক্ষ্যের হাবভাব তার ব্যবস্থায় দেখা দেয় না—যতটা সম্ভব ও-বস্তুকে সে সরিয়ে সরিয়ে রেখেছে; বস্তুর মধ্যে সে জিনিষ থাকতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যে তা ধরা পড়ে নাই।

বৈজ্ঞানিকের অতিরিক্ত বা উপরন্তু দৃষ্টি দিয়ে দেখলে জড়ের কারু-কার্য্যের লীলালাস্যের হেতু হিসাবে অন্য রকম শক্তির—নিভৃত একটা চেতনারই চাপ লক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই অতিরিক্ত বা উপরন্তু দৃষ্টি চান নাই—কিন্তু না চাইলে কি হবে, বিজ্ঞান এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেচে, জড়ের পরদা খুলতে খুলতে এমন একটা স্তরে আমরা উপস্থিত হয়েছি যেখানে বৈজ্ঞানিকেরা আর কেবল বৈজ্ঞানিকই থাকতে পারছেন না, বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে করতে তাত্ত্বিক দার্শনিক আধ্যাত্মিক তথ্যের সাথে বাধ্য হয়ে পরিচয় লাভ করতে হয়েছে।

ফলত নব্যবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই ঠিক ফুটে উঠেছে এই এখানে—আজকালকার পদার্থবিদ্যা গণিতবিদ্যার অঙ্গ হতে চলেছে বললে অত্যুক্তি হয় না, আর সকল বিজ্ঞানের মধ্যে গণিতই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি নিস্পদার্থ (অপদার্থ বললাম না অর্থাৎ most abstract)। নব্য-বিজ্ঞান পদে পদে এমন সব বাক্য, এমন সব ভাব, এমন সব বিধিব্যবস্থা উল্লেখ করে চলেছে, যা বিজ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের জগতেরই অধিবাসী

বলে পরিচিত। Physics আজকাল metaphysics-এর পরিভাষায় কথা বলতে সুরু করেছে যদিও সে দিয়েছে তার নিজস্ব সংজ্ঞা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মুখ খুললেই শুনি কি কথা? Theory of Probability, Determinacy-Indeterminacy, Causality, Relativity ইত্যাদি—তাঁকে বাধ্য হয়েই যেন সূক্ষ্ম জড়াতীত বস্তুর ছন্দের সাথে মিল দিয়ে চলতে হয়েছে।

শুধু তাই নয়, Jeans বা Eddington-এর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সাথে তাঁদের জড়িত রয়েছে বৈজ্ঞানিক-অতিরিক্ত একটা বুদ্ধি। কিন্তু Planck-এর মত নির্জলা নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিকও কি সব বলছেন? কারণকার্য্যশৃঙ্খলা অটুট রয়েছে, নির্দ্দেশ্যতাও (Determinacy) ঘায়েল হয় নাই, পেয়েছে একটা বৃহত্তর অর্থ – এভাবে পূর্ব্বতন বিজ্ঞানের ভিত্তি পূর্ব্বতনই রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি বলছেন, বিজ্ঞান যে কেবলই গাণিতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা নয়—"the pure rationalist has no place here." বৈজ্ঞানিকেরও বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির অঙ্গ হিসাবে চাই বুদ্ধির উৎক্রান্তি (intellectual leap), কল্পনাশক্তি (Imagination), অপরোক্ষানুভূতি (Intuition), এমন কি "অন্ধ-বিশ্বাস" (Faith)। একি ভূতের মুখে রামনাম নয়?

তাই মনে হয়, বিজ্ঞান আর শক্তমাটির (terra ferma) উপর দাঁড়িয়ে নাই—একটা লঘিমাসিদ্ধি তাকে পেয়ে বসেছে, একটা সূক্ষ্মতর অন্তরীক্ষে সে উঠে গিয়েছে, যেখানে তার চোখে আর একটা লোকের আভা কথঞ্চিৎ এসে পড়েছে। ফলে নব্যবিজ্ঞান আধ্যাত্মিক হয়ে উঠে নাই, সত্য বটে ; কিন্তু সে আর একান্ত আধিভৌতিকও নয়—আমি বলব সে হয়েছে আধিদৈবিক।

বিচিত্রা, কার্ত্তিক, ১৩৪৪

অধ্যাত্মে ও বিজ্ঞানে

বিজ্ঞানের গর্ব্ব এই যে তার কারবার অকাট্য প্রমাণ নিয়ে। অকাট্য প্রমাণের উপর তার সত্য প্রতিষ্ঠিত; আর অকাট্য প্রমাণের উপর যে সত্য প্রতিষ্ঠিত নয় বা হ'তে পারে না, তাকে সত্য বলা চলে না, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক সত্য তা নয়, বিজ্ঞানের রাজ্যে তার স্থান নেই।

অকাট্য প্রমাণ বলি কাকে? একমাত্র জিনিস সেটি—প্রত্যক্ষ। শোনা কথা প্রত্যক্ষ নয়, আন্দাজ অনুমান প্রত্যক্ষ নয়, বুদ্ধি-রচিত ভাব-প্রণোদিত কথা প্রত্যক্ষ নয়; হ'লেও হ'তে পারে, হ'লে ভাল হয় তাই সত্য ব'লে মানা উচিত—এ ধরণের বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শের তাগিদে কল্পিত তথ্য বিজ্ঞানে বাতিল। প্রত্যক্ষ তা হ'লে কি, কি ধরণে গ্রহণ হ'লে, অনুভব হ'লে সিদ্ধান্ত হ'লে বলতে পারি প্রত্যক্ষ হয়েছে? প্রত্যক্ষ অর্থ সাক্ষাৎ চক্ষুর সম্মুখে দেখি যাকে। এই উপায়েই জিনিস এমন নিশ্চিত নিঃসন্দেহ হয় যাতে অণুমাত্র দ্বিধার অবকাশ থাকে না; অবশ্য সাধারণ ভাবে ইন্দ্রিয়ের স্পর্শই প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয় যার সাক্ষ্য দেয় তাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গৌণ পোষকতা থাকলেও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ই অগ্রণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিখুঁৎ নিপুণ।[১] চোখে দেখাই প্রত্যক্ষ; যে জিনিস চোখে দেখি না, চোখে দেখবার সম্ভাবনাও নেই তা অপ্রত্যক্ষ সুতরাং অসত্য—বৈজ্ঞানিকের হিসাবে। প্রত্যক্ষের এই হ'ল মূল ও আদি অর্থ।

কিন্তু ইন্দ্রিয় যে ভুল-ভ্রান্তি করে না, চোখের দেখা হ'লেই তা যে অকাট্য সত্য হবে, এমন কি কথা আছে? পাণ্ডুরোগগ্রস্ত সকল জিনিসই

১ একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলেছেন—La vue qui est l'organe scientifique par excellence.

দেখে হরিদ্রারঞ্জিত, বর্ণান্ধ বর্ণবৈষম্য লক্ষ্য করতে অক্ষম। কিন্তু কেবল ব্যাধিপীড়িত বৈক্লব্যদুষ্ট নয়, সুস্থ সবল ইন্দ্রিয়েরও অনেক সময়ে অলীক দর্শন হয়—যেমন ভূতপ্রেত অশরীরীছায়া দর্শন। এ-জাতীয় প্রত্যক্ষের কোন মূল্য নেই আমরা সকলেই জানি। সুতরাং প্রত্যক্ষকে সীমাবদ্ধ করতে হয় আর একটি সর্ত্ত দিয়ে—তা হ'ল এই যে প্রত্যক্ষ কেবল একের নয়, এমন কি বহুরও নয়, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই সকলের। যে প্রত্যক্ষ কেবল ব্যক্তিগত তাই অলীক হ'তে পারে, সকলের কাছে সমান ভাবে যা প্রত্যক্ষ তাই বাস্তব। কিন্তু এ কথাও কি বলা চলে? সমষ্টিগত দৃষ্টি-বিভ্রম কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মরীচিকা ত সকলের প্রত্যক্ষ। যে কেহ মরুতে যায় (বিশেষ স্থানে ও ক্ষণে) সেই তা দেখতে পারে। তবু মরীচিকা অলীক। কেন? কারণ নিকটে যাও, দেখবে সে সরে দাঁড়িয়েছে অথবা মিশিয়ে গেছে, নাস্তি। অর্থাৎ সে দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নয়, সে হল দ্রষ্টারই দৃষ্টির রচনা। দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ বাস্তব বস্তুর তবে সন্ধান হয় কি রকমে? বাস্তব বস্তুর দর্শন হওয়া চাই অবিসংবাদী—কেবল সকল দর্শকের পক্ষে নয়, সকল সময়ে (অর্থাৎ দেখা যখনই ন্যায্য তখনই—স্পষ্ট দৃষ্ট অন্তরায় কিছু এসে না পড়লে) হওয়া চাই।

তবুও দর্শনের সব আটঘাট বাঁধা হ'ল না। কারণ এমন জিনিষ এমন ঘটনা আছে যা সকলে সকল সময়ে সাক্ষাৎ করে, তার দর্শন সকলের পক্ষে সর্ব্বদা অবিসংবাদী—অথচ তা সত্য নয়। সূর্য্য পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমে চলেছে, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে[১]—এ ত সকল লোক সকল সময়ে

[১] পৃথিবীর উপর থেকেও পৃথিবীর গতি চাক্ষুষ দেখা কি রকমে সম্ভব তার দু-একটি কলাকৌশল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন বটে। কিন্তু সেগুলিতেও পৃথিবীর গতি যে চাক্ষুষ দেখা যায় এমন কথা ঠিক বলা চলে না; বলা চলে বড়জোর, পৃথিবীর গতি ধরে নিলে সে কলাকৌশলগুলির সহজ ও সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দেখেছে, দেখছে এবং দেখবে (হয়ত) ; তবু এটি অসত্য, বিজ্ঞানেই আবিষ্কার করেছে। (এমন কি অনেকে বলেছেন স্বয়ং সূর্য্যটি—যাকে এমন অবিসংবাদী বাস্তব বোধ হয়—তাও মরীচিকার মতনই দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র—আলোকরশ্মির বক্রগতিজনিত মায়া-সৃষ্টি।)

প্রত্যক্ষ প্রমাণের তবে আরও সংশোধন করা প্রয়োজন হয়েছে। প্রত্যক্ষ বস্তু (সকলের ও সকল সময়ের হলেও) বাস্তব সত্য হ'তে পারে তখনই যখন অন্যান্য প্রত্যক্ষের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে, অন্যান্য প্রত্যক্ষকে সে নাস্তি না করে. অন্যান্য প্রত্যক্ষ তার প্রত্যক্ষতা সমর্থন করে। এর থেকে একটা অবশ্যম্ভাবী সূত্রে পৌঁছতে হয়, তা হ'ল এই যে, সকল প্রত্যক্ষ মিলে যদি একটা অপ্রত্যক্ষের সাক্ষ্য দেয় তবে সে অপ্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষবৎ বাস্তব। সূর্য্যের স্থিরত্ব এবং পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখী গতি এই ভাবেই আবিষ্কৃত ও সিদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু ফলে শেষটা দাঁড়াল কি ? দেখছি প্রত্যক্ষকে জোর করে একান্ত ভাবে আঁকড়ে ধরবার ফলেই ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষকে ছেড়ে অনেক দূরে এসেছি—অনুমানের কোঠায় গিয়ে পড়েছি, যদিও বলছি এ হ'ল "প্রত্যক্ষ" প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক অনুমান। কিন্তু এখানেও শেষ নয়, আধুনিক বিজ্ঞান আরও আগে চলতে বলছে। এই যাকে বলছি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ অনুমান—সূর্য্য স্থির আর পৃথিবী সচল—এটি আপেক্ষিক সত্য মাত্র ; বিশেষ দ্রষ্টার বিশেষ স্থান কাল থেকে দেখার ভঙ্গী মাত্র। দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ হিসাবে ও-তথ্যটির কোন অর্থ নেই। প্যারাস্যুটটা পৃথিবীর উপর ছুটে নেমে আসছে, না সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটি সহ পৃথিবী-টাই প্যারাস্যুটটার দিকে ছুটে উঠে আসছে—ব্যাপারটি দু-রকমেই দেখা যেতে পারে এবং দুটিরই সমান রাশিফল। টলেমি, কোপরনিকস, নিউটন আর আইনষ্টাইন ব্রহ্মাণ্ডের যে বিভিন্ন চিত্র দিয়েছেন তার কোনটি যে বাস্তব, বাস্তবের প্রতিলিপি তা কে বলতে পারে ? টলেমির

চিত্র জটিল হ'তে পারে কিন্তু তাঁর (epicyclic) ছক দিয়েও (আধুনিক ছকের মতই) চন্দ্রগ্রহণ ঠিক করা যেত। তবে এক হিসাবে বলা যেতে পারে এই মহাপুরুষ কয়জনের হাতে ব্রহ্মাণ্ড-চিত্র পেয়েছে একটা ক্রম-পরিণতি। প্রথমে যা ছিল জটিল্ সঙ্কীর্ণ ব্যষ্টিমুখী, ক্রমে তা হয়ে উঠেছে সরল ব্যাপক সর্ব্বসাধারণমুখী। কিন্তু এ ত সূত্রকারের কৌশল—কত বেশী জিনিস কত অল্প কথায় বেঁধে রাখা যায়। সত্য-অসত্য, বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন এখানে নেই। সূত্রকে ব্যাপকতর করে তোলা অর্থই যে সত্যের নিকটতর হওয়া এমন বলা চলে না—ফলতঃ ব্যাপকতর হওয়া অর্থ আমরা দেখছি অধিকতর নির্বাস্তব হয়ে ওঠা।[১]

মোট ব্যাপার তবে হ'ল এই। ইন্দ্রিয়গত অনেকগুলি প্রত্যক্ষ—যতই বিষম বিরূপ হোক না, তাদের সম্মিলিত করা, একটা সাধারণ সূত্রের মধ্যে গ্রথিত করার নাম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। প্রাকৃতিক নিয়ম যা বলা হয় তা এই সূত্র মাত্র—মানুষের মনের রচিত শৃঙ্খলা শুধু। সুতরাং মানুষের মনের বাহিরে, বাস্তবে তার অস্তিত্ব কিছু নেই। বিজ্ঞানের গোড়াকার দারুণ কড়া পাহারা এই রকমে অজ্ঞাতসারেই একটা অশরীরী অবাস্তব মনোময় তত্ত্বের অনিশ্চয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছে—কঠোর জড়বাদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছে শেষে ধোঁয়াটে অজ্ঞেয়বাদের মধ্যে।

ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষকে ধরে থাকলে অনুমানের মধ্যে, জল্পনার এবং কল্পনার মধ্যে গিয়ে যে পড়তে হবেই তা আর এক ধারা অনুসরণ

১ আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বে সকল সমীকরণ সর্ব্বদা চেয়েছে দ্রষ্টাকে কি রকমে বাদ দিয়ে চলা যায় ও কি রকমে ও কি প্রকার দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ বস্তু পাওয়া যায়। তবে এ পথে তিনি পৌঁছেছেন এমন এক গাণিতিক বস্তু জগতে যার সঙ্গে দৃশ্য বা দৃষ্ট বাস্তবের কোন মিল বা সমতৌল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

করলেও আমরা দেখতে পারি। অবশ্য এ কথা সহজেই বোঝা যায় বিজ্ঞানের—এবং সকল জ্ঞানের—প্রধান কাজই হ'ল দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে পৌঁছান—দৃষ্ট কার্য্য থেকে অদৃষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। কিন্তু অদৃশ্য কারণ অনেক সময়ে প্রথমে অনুমান করা হয়, শেষে প্রত্যক্ষ হয়—নেপচুন বা হেলি ধূমকেতুর প্রত্যাবর্ত্তন যে রকমে প্রথমে অনুমিত, পরে দৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু অনেক সময় বিজ্ঞান এমন অদৃশ্যের কথা বলে যা চিরকালই অদৃশ্য থেকে যায় এবং যার অস্তিত্ব কেবল বিশ্বাসের বিষয় মাত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বের গোড়ার বস্তু আবিষ্কারের জন্য দৃশ্যকে কেটে কেটে যথাসম্ভব খণ্ড খণ্ড ক'রে শেষে এসে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ-কণায়। বলা হচ্ছে বিদ্যুৎকণা (নানা ওজনের নানা প্রকৃতির)—বা কণা না ব'লে বলা উচিত ঢেউকণা নিয়েই বিশ্বজগৎ। সকল বস্তু, প্রত্যেক বস্তু নানাসংখ্যক ঢেউকণার নানা ভাবে সজ্জিত আকার মাত্র। কোন বস্তুর কি বৈদ্যুতিক আকার তারও ছক এঁকে নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

কিন্তু এই গোড়ার কথাতেই যদি প্রশ্ন তুলি বিদ্যুৎ কি প্রত্যক্ষের বস্তু ? কোন বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎ চোখে দেখেছে ? বলতেই হয় সে-ভাবে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি, চোখে দেখেনি। প্রত্যক্ষ হয়, চোখে দেখা যায় কেবল একটি জিনিস—আলো। বৈজ্ঞানিক (বৃহৎ ছেড়ে যখন ক্ষুদ্রে, অণু-পরমাণুতে পৌছেছেন সেখানেও) দেখেছেন আলোর ছটা, আলোর নানা প্রকার গতিবিধি। প্রত্যক্ষবাদীর আলো ছাড়া দ্বিতীয় গতি কি থাকতে পারে, আলোর অতিরিক্ত আর কি তার প্রতীতির মধ্যে আসতে পারে ? আলো, আলো-ছায়ার বহুরূপা লীলা দেখছি কিন্তু আলোর পিছনে যে বস্তু মেনে নিয়েছি, এই আলোর লীলার ব্যাখ্যার জন্য তা ত অনুমান। এক সময়ে আলোর আশ্রয়স্বরূপ এক ঈথরকে কল্পনা করা হয়েছিল, ও বস্তুটি স্বতঃসিদ্ধান্তরূপেই সর্ব্ববাদিসম্মত হয়ে

গিয়েছিল। কিন্তু আইনস্টাইন এসে বললেন—ওটার কোন প্রয়োজন নাই, ওটি বাহুল্য মাত্র। আলোর পিছনে যে বৈদ্যুতিক জগতের ছক এঁকে দিয়েছি তাও ঐ আলোর ফুলঝুরির ব্যাখ্যার জন্য, তার একটা সূত্র বানিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু ছক—আইনস্টাইনের equation আর বৈয়াকরণের সহর্ণের্ঘঃ একই পর্য্যায়ের—তাইত ছকটা প্রতিনিয়ত বদলাতে হচ্ছে। আলোর স্বরূপ কি তা-পর্য্যন্ত জানি না! তার আচার, ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে তাও সেই জিনিস যাকে বলা হয় বিদ্যুৎ। আলোর এক বিশেষ গতিবিধি হলে বলি বিদ্যুৎ, আর এক বিশেষ গতিবিধি হলে বলি আলো।

আলোর পর্দ্দা দিয়েই আমাদের চোখ আঁটা; আলো-ছায়ার বাহিরে যে বস্তু তা জল্পনার বিষয়। তাই বুঝি উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং, প্রোজ্জ্বল পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা—হে সূর্য্য তাকে দূরে সরিয়ে দাও।

অধ্যাত্ম-সাধক সত্যের সন্ধানে তাই চলেছিলেন একটু বিভিন্ন পথে। অধ্যাত্ম-সাধকও চান প্রত্যক্ষ অনুভূতি, সাক্ষাৎকার। কিন্তু এই চক্ষু দিয়ে নয়; এই চক্ষুর পশ্চাতে যে চক্ষু রয়েছে—এই দৃষ্টি দিয়ে নয়, এই দৃষ্টির দ্রষ্টা যে তাকে দিয়ে হবে প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎকার। কি সে জিনিস—চক্ষুর চক্ষু, দৃষ্টির দৃষ্টি? চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য। চৈতন্য কি বস্তু? বৈদান্তিক বলছেন রূপ (অথবা রূপময়) থেকে রূপকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই ব্রহ্ম। সেই রকমে বলা চলে জ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান থেকে জ্ঞানবৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে বাকী থাকে যা তাই চৈতন্য। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম চলেছে একই লক্ষ্যে—বাস্তবের সাক্ষাৎ অনুসরণে—তবে উভয়ের পথ বিভিন্ন স্তরে, সমান্তরাল রেখায়। চোখ প্রত্যক্ষ করে জড় আলো—চৈতন্য প্রত্যক্ষ করে জ্যোতি। স্থূল দর্শনে মিলতে পারে স্থূল আলোই, অন্তর্দর্শনে দেখা যায় চিন্ময়

আলো—জ্যোতিরুত্তমম্। স্থূল আলোতে বড়জোর প্রতিফলিত হয় বাহ্যরূপ, আকার, কিন্তু চৈতন্যে ধরা দেয় স্বরূপ, বস্তুর অন্তঃস্থ সত্তা ও ধর্ম্ম। চোখের দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকতে বাধ্য, সেখানে যে পর্দা ঘনিয়ে আসেই, অন্তর্দৃষ্টিতে তার কোন সম্ভাবনাই নেই, তা নিষ্কলুষ, নির্নিমিখ।

উত্তমজ্যোতি আছে কি না তার প্রমাণ দর্শন—তোমার দর্শন, আমার দর্শন, সকলের দর্শন বা দর্শনের সম্ভাবনা। জড়, যাকে প্রথম দৃষ্টিতে দূর হ'তে মনে হয় স্থাণু নিরেট গাঢ় তমসাচ্ছন্ন (বাহিরের আলোতেই সে আলোকিত হয় মাত্র), সেই জড় এখন বৈজ্ঞানিকের নিকটতর নিবিড়তর সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে দেখা যায় নৃত্যপর আলোক-স্ফুলিঙ্গরূপে। সমস্ত জড় সৃষ্টিটাই গঠিত এই আলোক-স্ফুলিঙ্গের ছন্দিত লীলায়। কেবল সূর্য্য বা নক্ষত্ররাই যে স্বয়ম্প্রভ তেজের পুঞ্জ তা নয়, এই পৃথিবীর, মাটির, প্রতি ধূলিকণাও, এই দেহের প্রতি অণু তেজোময়; অন্য রকম যদি দেখায় তবে তার কারণ বাহ্য সাধারণ দৃষ্টির অক্ষমতা—তা দৃষ্টিবিভ্রম বা দৃষ্টির স্থূলতার পরিচয় মাত্র।

ঠিক সেই রকমে বৈজ্ঞানিকের অ-স্থূল জ্যোতির পশ্চাতেও আছে আর এক সূক্ষ্ম জ্যোতি—সূক্ষ্ম হলেও তা কম বাস্তব নয়, বরং তাই হল সত্যতর বাস্তব। এ সূক্ষ্ম জ্যোতির জন্য দৃষ্টিও হওয়া প্রয়োজন আরও সূক্ষ্ম আরও নিবিড়—কিন্তু তাকে এত সূক্ষ্ম এত নিবিড় হ'তে হয় যে সে কেবল মাত্রা হিসাবে ভিন্ন নয়, গুণধর্ম্ম হিসাবে, একটা পর্য্যায় হিসাবেই ভিন্ন হয়ে পড়ে। জড়-বৈজ্ঞানিকের বাহাদুরি এমন স্পর্শালু গ্রহণ-তৎপর যন্ত্র আবিষ্কার করা, প্রস্তুত করা যাতে স্বতঃই প্রতিফলিত অঙ্কিত হয় সূক্ষ্মতর আলোর স্ফুরণ। অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিকেরও অনুরূপ কৃতিত্ব।

আমরা বলেছি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রত্যক্ষতা পর্য্যবসিত হয়েছে আলোর চিত্রে। আলোর খেলাই দেখা যায়—সাদা মোটা চোখে

তার বেশী দেখি না, সূক্ষ্মতর (যান্ত্রিক) চোখ দিয়েও তার অতিরিক্ত কিছু দেখি না। আলোর পিছনে কি যে বস্তু তা গবেষণার বিষয়, আলো নিজেই বা কি তাও অনুমানের বিষয়। আলোর গতিবিধি অনুসারে নানা রকম চিত্র, ছক এঁকে তুলছি—তাকেই নাম দিয়েছি প্রাকৃতিক নিয়ম, সমীকরণী সূত্র। কিন্তু তাতে বাস্তব বস্তুর বেশী নিকটে যে আসতে পেরেছি তা নয়।

কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টির ধর্ম্ম একটু পৃথক্। চিন্ময় চক্ষু কেবল জ্যোতিকে নয়, জ্যোতির্ম্ময়কেও দেখতে পারে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দৃষ্টির সঙ্গেই রয়েছে উপলব্ধি, রূপের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুর বা সত্তার উপলব্ধি। বৈদিক ঋষি এই কথাটিই হয়ত বলতে চেয়েছেন তাঁর এই মন্ত্রে : জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ; সত্য-সূর্য্যের সঙ্গে দৃষ্টি সম্মিলিত অচ্ছেদ্য একীভূত—লক্ষ্যবদ্ধ শরের মত তন্ময়।

কারণ অধ্যাত্ম-দৃষ্টি অর্থ একাত্মতা। আধ্যাত্মিক জ্ঞান হল এই একাত্মতা ; সত্য এখানে লাভ হয় এই একাত্মতার ফলে। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। শুধু ব্রহ্ম সম্বন্ধে নয়, সকল আপেক্ষিক উপাধিক বস্তু বা অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এই সত্য প্রযোজ্য। বৈজ্ঞানিক দর্শনের জন্য দৃষ্টি-শক্তিকে একাগ্র সূচীমুখ করেছেন (অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সহায়ে), এ উপায়ে বস্তুর, অস্তিত্বের একটা ছায়াচিত্র পাই (প্লেটো-কথিত বিখ্যাত গুহার দৃষ্টান্তে যেমন) ; এই চিত্র যে চিত্র মাত্র, বস্তু হয়ত নয়, এবং বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বিশেষ আছে কি না, এ রকম সন্দেহ অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাত্ম-দৃষ্টিও সূচ্যগ্র একমুখী শাণিত ও প্রখর। তবে স্থূল-আলো-আশ্রয়ী নয় ব'লে, চিন্ময় বা চেতনার দৃষ্টি ব'লে তাতে এসেছে আর এক গুণ। সে কেবল বাহিরের অবয়ব অনুসরণ করে না, রূপের চিত্র প্রতিফলিত করে না, সে প্রবেশ করে রূপের অন্তরে রূপীর মধ্যে

এবং তাতে ওতপ্রোত একীভূত হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকের ভৌতিক দৃষ্টি দিয়ে জিনিসের দেখি বা গড়ি নানা জ্যামিতিক আকার। দৃষ্টির কেন্দ্র যেদিকে যেমন বদলে ধরি, সেই অনুসারে ঐ আকারেও পরিবর্ত্তন এসে পড়ে—এই যেমন মোটামুটি ভাবে বলা চলে, প্রথম, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি (common sense view), তারপর নিউটনীয় দৃষ্টি, তারপর আইনস্টাইনীয় দৃষ্টি। কিন্তু চিন্ময় দৃষ্টি বস্তুর অন্তর্ভেদ ক'রে তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়; সে-দৃষ্টিতে সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আপেক্ষিকত্ব নাই, তার সত্য নিরপেক্ষ সত্য, বস্তুর নিজস্ব সত্য—দ্রষ্টার দৃষ্টি-পরিচ্ছিন্ন সে সত্য নয়।

প্রাচীন যুগে পারমার্থিক অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকেও অনেক আধিভৌতিক তত্ত্ব এই পথে আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রাচীন ঋষি উদ্ভিদের সম্বন্ধে যখন বলেছেন তারা ভিতরে ভিতরে সজ্ঞান, তাদের ভিতরে ভিতরে রয়েছে সুখদুঃখ-বোধ (অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখ-সমন্বিতাঃ) তখন তাঁরা যে একটা কবিত্বময় কল্পনার বিলাস মাত্র দেখিয়েছেন তা নয়, উদ্ভিদের সঙ্গে একাত্মতার ফলে তাঁদের এ-জ্ঞান এসেছিল, এ-সত্য লাভ হয়েছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিখ্যাত তথ্যটি—চলা পৃথ্বী স্থিরা ইব ভাতি—যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের ফলে নয়, অনুরূপ একটা একাত্ম অনুভূতির ফলে আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, মনে হয় সেই রকম সম্ভাবনাই বেশী। ভেষজশাস্ত্রে দ্রব্যগুণের সন্ধানও অনেক হয়ত এই উপায়ে প্রথমে মিলেছিল। অবশ্য এ রকম একাত্মানুভূতির ফল নির্ভর করে সত্য সত্যই একাত্মানুভূতি হয়েছিল কি না তার উপর, নতুবা সিদ্ধান্তটি হয় একটা মিশ্রণ, খানিকটা সত্য উপলব্ধি, আর খানিকটা মস্তিষ্কের কল্পনাজল্পনা।

প্রকৃতপক্ষে, "একাত্মানুভূতি" নামটি অত্যন্ত দার্শনিক হ'লেও এবং অতি বিরল বস্তু ব'লে মনে হলেও বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিকে-

রাও যে এই জিনিষটিরই কল্যাণে নব নব আবিষ্কার করতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নাই। লৌকিক কথায় যাকে বলে good hit, সাধু ভাষায় যাকে বলে intuition এবং বৈজ্ঞানিকেরা যে working hypothesis-এর কথা বলেন তার অনেকগুলিই—যেগুলি যতখানি সত্য বাস্তব, ততখানি তারা—সেই একাত্মানুভূতির একটা প্রকাশ, প্রতিচ্ছবি, উদাহরণ।

বিজ্ঞান যে-আলো হাতে নিয়ে, গ্রীক সাধু ডাইওজেনেসের মত জগৎ জুড়ে সত্যের জন্য ঢুঁড়ে বেড়ায়, সে আলো ত তার নিজের ভিতরের আর একটা আলোর প্রতিরূপ—তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। অবশ্য বিজ্ঞানে প্রশ্ন করতে চায় না আলোর আলো কে বা কি। তার মনে হয় কি একটা অবৈজ্ঞানিক কাজ সে ক'রে ফেলল। কিন্তু জ্ঞানের এ হ'ল স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য কৌতুহল; প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক—বৈজ্ঞানিক হিসাবে না হোক—এ সমস্যার দুয়ারে এসে পৌঁছেছেন, এর মীমাংসার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

২

বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির, জয়জয়কার। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, তার একান্ত জড়দৃষ্টি, সর্ব্বতোভাবে যদি না-ই সত্য হয়, তবুও বলা হয়, তার পদ্ধতি, জ্ঞান আহরণের জন্য, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য যে-প্রণালী যে-যন্ত্র সে আবিষ্কার করেছে তা নির্দ্দোষ নিখুঁৎ; বিজ্ঞানাতিরিক্ত ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য—শুধু প্রযোজ্য নয়, অবশ্য প্রযোজ্য, খাঁটি সত্যকে যদি আবিষ্কার করতে হয়। তাই সমাজতত্ত্বে, শিক্ষাতত্ত্বে, মনস্তত্ত্বে, এমন কি আধ্যাত্মিক তত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ আজকালকার অপরিহার্য্য রীতি হয়ে উঠেছে।

অধ্যাত্মে ও বিজ্ঞানে

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি ঠিক কি? অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাকে বলি আগে তা একটু জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক যুগের আগে, এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই চল ছিল শাস্ত্রালোচনায়, জ্ঞানচর্চায়। তার প্রথম ধারা হ'ল, কোন লোকের কথা, কোন বিশেষ গ্রন্থের কথা আপ্ত-বাক্য নামে বিনা দ্বিধায় সত্য ব'লে গ্রহণ করা। এবং একবার কোন (তথাকথিত) সত্যকে এই ভাবে গ্রহণ করলে, তা থেকে অনুমিত তার সমর্থিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য সত্য ব'লে স্বীকার করা; আর তার বিপরীত বা বিরোধী যা কিছু তাকে অসত্য ব'লে মেনে নেওয়া। এই যেমন একটা আপ্তবাক্য হ'ল—"ভগবান্ এক আছেন যিনি বিশ্বের স্রষ্টা পাতা হর্ত্তা, যিনি পরম কারুণিক পরম ন্যায়নিষ্ঠ পরম বিচারক," ইত্যাদি—এই মূলসূত্র থেকে নির্গত হয় আরও বহুল বিবিধ সিদ্ধান্ত, যথা, স্বর্গ সম্বন্ধে, নরক সম্বন্ধে, পরলোক সম্বন্ধে, জন্মান্তর সম্বন্ধে, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়, সাধুর পরিত্রাণ দুষ্কৃতের বিনাশ অর্থাৎ একটা সমগ্র পুরাণ। অথবা আর একটি আপ্তবাক্য—আধ্যাত্মিক ছেড়ে যদি লৌকিক জগতের কথা ধরি—এই যেমন চন্দ্রগ্রহণ হ'ল চন্দ্রের রাহু নামক রাক্ষসের গ্রাসে পড়া—এ সম্পর্কে রাহু চন্দ্রকে কেন গ্রাস করে, কি রকমে আবার ছেড়ে দেয় ইত্যাদি সমস্যারও মীমাংসা রয়েছে।

এ-সব হ'ল বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন কল্পনার, জল্প-নার বিষয় মাত্র। কিন্তু এ ছাড়া আছে আর এক রকম অবৈজ্ঞানিক ধারা—একটি মাত্র উদাহরণের জোরে একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা, একটি বা অল্প কয়েকটি ঘটনা হ'তে একটা সার্ব্বভৌমিক সত্যে পৌঁছা। এই যেমন একটি সাধারণে প্রচলিত মতবাদ যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বর্ষাকালে বেশী জল হয়। এ-কথা সাধারণ সত্য হিসাবে প্রমাণসহ নয় (আবহবিজ্ঞান বলছে), যদিও এক-আধ বার ও-বিশেষ ঘটনাটি হয়ত ঘটেছিল।

এই দুটি অবৈজ্ঞানিক ও ভুল পথ সংশোধন ক'রে বৈজ্ঞানিক স্থাপন করেছেন তাঁর বিজ্ঞানের দুটি মূল স্তম্ভ—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ। এই দুটি প্রক্রিয়া নিয়েই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশেষত্ব। শোনা কথা মানা নয়, কারো উক্তি মানা নয়, জিনিসকে করা চাই পর্য্যবেক্ষণ। তার পর এক বার পর্য্যবেক্ষণ নয় বহুবার পর্য্যবেক্ষণ, বহু বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ, বহুভাবে পর্য্যবেক্ষণ, জিনিষকে কষে দেখা, বাজিয়ে নেওয়া—এর নাম হ'ল পরীক্ষণ। পর্য্যবেক্ষণে জিনিস প্রত্যক্ষ করি এবং পরীক্ষণে প্রত্যক্ষকে যাচাই ক'রে নিই।

কিন্তু এখানে একটা গোড়াকার প্রশ্ন করা যেতে পারে। পর্য্য-বেক্ষণ ও পরীক্ষণ আবশ্যক ও অপরিহার্য্য, মেনে নিলাম—কিন্তু কে পর্য্যবেক্ষণ করবে? তার উপরই কি সব নির্ভর করে না? এক-এক মানুষ এক-এক রকমে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে; সুতরাং মানুষের ব্যক্তিগত অংশটা এ-ক্ষেত্র হ'তে বাদ দিয়ে রাখতে হবেই। তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করতে হবে, নির্ণয় করতে হবে মানুষের কোন্ অঙ্গ বা বৃত্তি পর্য্যবেক্ষক বা পরীক্ষক? বিজ্ঞান অবশ্য ব্যক্তিবিশেষকে বাদ দিয়ে এক কাল্পনিক সাধারণ দ্রষ্টার কথা বলছে—কিন্তু এখানেও জিজ্ঞাস্য সে কাল্পনিক দ্রষ্টার দৃষ্টির স্বরূপ কি? তার দৃষ্টির যে আলোকপাত তার গুণ কি প্রসার কি?

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, সে একটা বিশেষ অঙ্গ বা বৃত্তিকেই পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষক ক'রে স্থাপন করেছে। পর্য্য-বেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে ব'লেই, এ দুটি প্রক্রিয়ার জন্যই যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান তা ঠিক নয়—অন্যান্য জ্ঞানেও এ দুইটি প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় ও গ্রহণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান বরং বিজ্ঞান কারণ সে এই দুটি প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেছে একটা বৃত্তি-বিশেষের ধর্ম্ম হিসাবে এবং ফলে একটি বিশেষ ক্ষেত্র বা পরিধির মধ্যে তাদের আবদ্ধ রেখেছে। এই

পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ হওয়া চাই স্থূল ইন্দ্রিয়ের—অন্ততঃ পক্ষে স্থূল ইন্দ্রিয়কে যন্ত্ররূপে গ্রহণ করে, স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে।

অবশ্য স্থূল ইন্দ্রিয় যথাসম্ভব একান্তভাবে পর্য্যবেক্ষক (এবং কিছু দূর) পরীক্ষকও হয়েছে ইতর প্রাণীর মধ্যে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষক হয়েছে মন-বুদ্ধি, (ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী) মনবুদ্ধি। এবং এই জন্য তার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পেয়েছে একটা পরিণতি ও পূর্ণতা যা ইতর প্রাণীতে নেই। তবুও স্থূল ইন্দ্রিয়ই হ'ল মানুষের প্রধান যন্ত্র। ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ক'রে মনবুদ্ধির সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকেই অন্য কথায় বলে যুক্তিবাদ। পর্য্যবেক্ষণের পরীক্ষণের কর্ত্তা যে আর কেউ বা কিছু হ'তে পারে বিজ্ঞানে তা মানে না, মানলে বিজ্ঞান অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয়ের পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ বিবর্জিত মনবুদ্ধির নিজস্ব যে জল্পনা তা আর এক রকম যুক্তিবাদ, তাকে বলা যেতে পারে তর্কবাদ ; তারই উদাহরণ দিয়েছি ইতিপূর্ব্বে—তা অবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয় (যদিও দর্শনে, তত্ত্ববাদে তার স্থান হ'তে পারে)।

ভারতীয় মনস্তত্ত্ব—ঔপনিষদ উপলব্ধি—এ-বিষয়ে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছে। মানুষের, জীবের আধারে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে যে জিনিসটি তার নাম পুরুষ। কেবল পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নয়, এই পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্ম (গীতার ভাষায়) চতুর্বিধ—তদনুসারে সে হ'ল (১) সাক্ষী, (২) অনুমন্তা, (৩) ভর্ত্তা, (৪) ভোক্তা। এই যে পুরুষ তার আছে আধারে স্তর-বিভেদে বিভিন্ন আসন বা পীঠস্থান ; প্রধানতঃ এই তিনটি—দেহে, প্রাণে, মনে। পুরুষ অর্থ চেতনার কেন্দ্র—দেহগত পুরুষ দেহের অধিষ্ঠাতা, প্রাণগত পুরুষ প্রাণের অধিষ্ঠাতা, মনোগত পুরুষ মনের অধিষ্ঠাতা। পুরুষের—চৈতন্যময় সত্তার—এই ভাবে ক্রমবিকাশ ক্রমপরিণতি হয়ে চলেছে। মন পর্য্যন্ত মানুষের

সহজ সাধারণ অবস্থা। মনের উপর হ'ল বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা উত্তর-মানস, তারই নাম "বিজ্ঞান" (বাংলায় প্রজ্ঞান বললেই ভাল হয়, কারণ বিজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝি জড়বিজ্ঞান, সায়ান্স)। বিজ্ঞানময় বা প্রজ্ঞানময় পুরুষের উচ্চতম স্বরূপ হ'ল অধ্যাত্ম--চেতনা, অধ্যাত্ম-সত্তা। মানুষের জ্ঞান-জগতে যে সৃষ্টি যে সংগঠন তার আরম্ভ মনোময় চেতনা দিয়ে এবং তার সম্যক্ পরিণতি প্রজ্ঞানময় পুরুষে। প্রত্যেক পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে ব্যক্তির মধ্যে এক-একটি স্তর গঠিত হয়েছে, তা ছাড়া সমষ্টির মধ্যে এক-একটি শ্রেণী বা জগৎ পর্য্যন্ত সংগঠিত হয়েছে। অন্নময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে জড়জগৎ. প্রাণময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে প্রাণীজগৎ, মনোময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে মানব জগৎ। আর প্রজ্ঞানময় পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে অধ্যাত্মজগৎ। প্রজ্ঞানেরও উপরে স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধতর চেতনা সব আছে এবং তৎ তৎ স্তরের পুরুষকে আশ্রয় ক'রে এক এক প্রকৃতি সৃষ্ট হয়েছে—এই ঊর্দ্ধতর স্তরের সংখ্যা উপনিষদে বলেছে তিনটি—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময় পুরুষ; এই তিনটি একত্রসংযুক্ত, এদের নিয়েই হ'ল সচ্চিদানন্দ। ঋগ্বেদে এরই নাম "ত্রিধাতু"।

বৈজ্ঞানিক আশ্রয় করেছেন মনোময় পুরুষকে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্নময় লোকে, জড়স্তরে এবং তার যন্ত্র বা হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহা করেছেন ইন্দ্রিয়সমবায়কে অর্থাৎ বহির্ম্মুখী প্রাণশক্তিকে। এই ইন্দ্রিয় উপকরণরাজিকে—বস্তু ঘটনা বা তাদের অনুভূতি প্রতীতিকে—এনে ধরেছে মনোময় পুরুষের সম্মুখে, ইনিই তাদের পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ ক'রে চলেছেন এবং সেই অনুসারে গ'ড়ে তুলেছেন সৃষ্টির এক ব্যাখ্যা এক ছক। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এ ছক আপেক্ষিক। এ-কথা ধরা পড়ে যদি আমরা দেখি দৃষ্টির কেন্দ্র সরিয়ে ধরলে কি ফল হয়।

প্রথমতঃ মন থেকে দৃষ্টিকেন্দ্র যদি নামিয়ে ধরি প্রাণে—প্রাণময় পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখা যায় জগৎ তার ছক হয় অন্য রকমের।

ইতর প্রাণীর দৃষ্টি হ'ল প্রাণময় পুরুষের দৃষ্টি—তাতে জগৎটা কি রকম রূপ নেয় সে-সম্বন্ধে গবেষকেরা বৈজ্ঞানিকেরা কিছু আন্দাজ করতে চেষ্টা করেছেন। অনেকে বলেছেন যেমন, তাদের জগৎ দ্বিমাত্রিক, মানুষের মত ত্রিমুখ নয় (তাদের দৃষ্টি যুগপৎ দুই দিকে মাত্র চলে—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, সেই সঙ্গেই উচেচ নীচে চলে না) অথবা তাদের বর্ণবোধ নেই, তারা দেখে শুধু আলো আর বিভিন্ন গাঢ়তার ছায়া। সে যা হোক ইতর প্রাণীর জগৎ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাতে সন্দেহ নেই। আরও নীচে নামলে, শুধু দেহজ পুরুষের দৃষ্টিতে জগতের চিত্র হবে তৃতীয় প্রকারের, হয়ত একমাত্রিক, অস্তি মাত্র কিছু—মনোময় পুরুষের বা প্রাণময় পুরুষের জগৎ হতে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।

নীচের দিকে না গিয়ে আমরা চলি যদি উর্দ্ধে—যেদিকে চলা সহজ ও স্বাভাবিক—পুরুষ চেতনাকে যদি উন্নীত করে ধরি, মনোময় কেন্দ্র হ'তে উত্তীর্ণ হই প্রজ্ঞানময় কেন্দ্রে, তবে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আর এক প্রচ্ছন্ন বাস্তব প্রকাশ পায়। মনোময় পুরুষ স্থূল ইন্দ্রিয়কে ধরে কেবল পরিচয় পায় জড়বস্তুর, অন্য সব বস্তুকেও দেখে এই জড়েরই রূপান্তর হিসাবে।[১] প্রজ্ঞানময় পুরুষের দৃষ্টিতে দেখি একটা জগৎ যেখানে বস্তু আর জড় নয় কিম্বা জড়েরই সূক্ষ্মরূপ তেজমাত্র (বিদ্যুৎকণা কি আলোকণা) নয়, বস্তু হ'ল চৈতন্যকণা ; ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও পাওয়া যায় আর এক সূক্ষ্মতর, অন্তরতর চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের খেলা। এই

১ দার্শনিক বা তাত্ত্বিক—বিশুদ্ধ ভাব বা চিন্তা নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁদের দৃষ্টি-কেন্দ্র হ'ল মনের উচ্চতর স্তরে এবং প্রজ্ঞানের নিম্নতর স্তরে, উভয়ে যেখানে মিশেছে, মনোময় পুরুষে যেখানে প্রজ্ঞানময় পুরুষের প্রভাব ও আলোক পড়েছে। এই অন্তর্বর্ত্তী মিশ্রিত জগৎ বেশির ভাগ হ'ল জল্পনা-কল্পনার, অনুমানের প্রস্তাবনার, বিচার-বিতর্কের ক্ষেত্র।

চৈতন্যকণা বা চিন্ময় তরঙ্গরাজির ধর্ম্মকর্ম্ম গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণই হ'ল অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অঙ্গ।

প্রজ্ঞানময় পুরুষের দৃষ্টি—পরিধি হিসাবে এবং গভীরতা হিসাবেও স্থূল ইন্দ্রিয়লব্ধ বাস্তবের স্তরে আবদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন নয়। অতীন্দ্রিয় বস্তুর, অতীন্দ্রিয় বিধানের সাক্ষাৎকার তাঁর হয়; আর ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়রাজিকেও সে দেখে এই অতীন্দ্রিয়ের বৃহত্তর পরিধি, গভীরতর গাঢ়তার মধ্যে রূপান্তরিত করে, মিলিয়ে ধরে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ইতিহাস হ'ল মনোময় পুরুষের ক্রমিক দৃষ্টি-প্রসার। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চলাচলের একটা সূত্র দিলেন টলেমি; তাকে ভেঙে একটা বৃহত্তর সূত্র দিলেন কোপরনিকস; কোপরনিকসকেও আরও বৃহত্তর সূত্রে অঙ্গীভূত করে নিল নিউটনীয় সূত্র। পরিশেষে আজ নিউটনীয় সূত্রকেও গ্রস্ত অঙ্গীভত ক'রে স্থাপিত হয়েছে আরও বৃহত্তর আইনস্টাইনীয় সূত্র। এ পর্য্যন্ত এসে মনে হয় বিজ্ঞান যেন পৌঁছেছে তার শেষ সীমায়। এখন যদি তাকে আরও এগিয়ে চলতে হয়, সত্য সত্যই নূতন আবিষ্কার করতে হয় তবে একান্ত জড়ের সীমানা তাকে অতিক্রম করতে হবে। অন্য কথায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও গবেষণায় মানুষ তার ইন্দ্রিয়াশ্রিত মনোময় পুরুষের দৃষ্টি চরমে প্রসারিত করেছে; এখন পূর্ণতর গভীরতর দৃষ্টির জন্য দ্রষ্টার চাই একটা নূতন ও অভিনব স্থিতি—আর তাই হ'ল প্রজ্ঞানময় স্থিতি।[১]

১ আধুনিক বিজ্ঞানে জড়কণা যে চৈতন্যকণার কতখানি সমধর্ম্মী হয়ে উঠেছে তা দেখাবার জন্য জনৈক বৈজ্ঞানিক দুটি আধুনিক তত্ত্বের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ জড়কণার স্থিতি সম্পর্কে দেশ ও কাল সম্যক নির্ণয় করা যায় না—ও দুটি অস্পষ্টভাবে, মোটামুটি হিসাবে ছাড়া যথাযথ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিমাণের মধ্যে ধরা যায় না। চৈতন্যকণার (একটি চিন্তা যেমন) সম্বন্ধেও কি ঐ কথা প্রযোজ্য নয়? দ্বিতীয় কথা, কোন জড়কণাকে স্বরূপতঃ পর্য্যবেক্ষণ করা যায় না, পর্য্যবেক্ষণ-পদ্ধতিই তাকে পরিবর্ত্তিত করে

বৈজ্ঞানিককে তাঁর জ্ঞানযন্ত্রের সম্যক্ প্রয়োগের জন্য একটা অনুশীলনের ধারা অনুসরণ করতে হয়,—সে অনুশীলনের দুটি সাধারণ সূত্র আমরা বলেছি—পর্য্যবেক্ষণ আর পরীক্ষণ। বলেছি, এই পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ চলে আবার একটা বিশেষ প্রণালী ও পদ্ধতি ধ'রে; মনোময় পুরুষই পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষক—যদিও এই পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষককের সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি দেওয়া হয় নি—ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাঠামে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, অন্ততঃ বাঁধতে চেষ্টা করা করা হয়েছে। এই চেষ্টা অর্থাৎ দুশ্চেষ্টা হয়েছে ব'লেই আধুনিক বিজ্ঞান নানা আত্মবিরোধের মধ্যে এসে পড়েছে—সে-সকল আত্মবিরোধের সম্যক্ মীমাংসা জড়াশ্রয়ী মনোময় পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে হবে না; সে-মীমাংসার জন্য উঠতে হবে উপরে।

কিন্তু প্রজ্ঞানময় পুরুষেও অধিষ্ঠিত হ'তে হ'লে প্রয়োজন একটা অনুশীলন—তারই নাম যোগসাধনা। সত্যোপলব্ধির, বাস্তব-নির্ণয়ের জন্য প্রজ্ঞানময় পুরুষের উপর ইন্দ্রিয়ানুভূতির শাসন প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন তো হয়ই না, সে তার মুক্ত অন্তর্দর্শনের পথে চলে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও জাগ্রত করে এক অন্তর্দৃষ্টি। মনোময় পুরুষের এক অন্তর্দর্শন আছে বটে—ইংরাজীতে যাকে বলে introspection; কিন্তু তা হ'ল মন যে স্তরে তার সেই নিজের স্তরে দাঁড়িয়েই চারিদিকে দৃষ্টিপাত—সে-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কেবলই কার্য্যপরম্পরা,

ফেলে। সেইরকম চেতনার কোন বৃত্তিকেও পর্য্যবেক্ষণ করতে গেলে সে বৃত্তি তখনই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়—ক্রোধের সময় যদি ক্রোধের বৃত্তিকে দেখতে যাই, তবে ক্রোধের মাত্রা হ্রাস পাবেই। জড়কণা ও চৈতন্যকণায় এ বোধ হয় অতি স্থূল রকমের সারূপ্য ও সাদৃশ্য। বৈজ্ঞানিককে বাধ্য হয়ে কোন পথে চলতে হয়েছে দেখাবার জন্য এই উদাহরণটির উল্লেখ করা গেল।

কার্য্যের অন্তরালে কারণের মূল উৎসের সন্ধান তাতে পাই না। অধ্যাত্মের প্রজ্ঞানময় পুরুষের দৃষ্টি হ'ল একটা ঊর্দ্ধ্বতর (বা গভীরতর) স্তর হ'তে নিম্নতর (বা বাহ্যতর) স্তরে দৃষ্টি, কারণের জগৎ থেকে কার্য্যের জগতে দৃষ্টি। আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাময় দৃষ্টিতে তাই স্বতঃই উদ্ভাসিত হয় জিনিসের কারণ বা হেতুপরম্পরা, তার পিছনের প্রচ্ছন্ন কলকব্জা।

ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী মনোময় পুরুষ দিয়েছে এক বাস্তবের পরিচয়—কিন্তু সে একটি বাস্তব মাত্র। এ ছাড়াও আরও বাস্তব আছে। অধ্যাত্ম পুরুষ যে-জগতের পরিচয় দেয়, তাও তেমনি বাস্তব, হয়ত আরও বেশী বাস্তব—কারণ জড় বাস্তবের নিভৃত মূলই সেখানে। একটি আর-একটির বিপরীত নয়, একটি আর-একটিকে অপ্রমাণ করে না। তবে বৈজ্ঞানিক যখন প্রজ্ঞানী হয়ে উঠবেন তখন তাঁর জড়াশ্রয়ী সঙ্কীর্ণ সূত্র চৈতন্যের বৃহত্তর সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আবশ্যক-মত পবিবর্ত্তিত সংশোধিত হবে।

প্রবাসী, আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৪৭

বৈজ্ঞানিকের ভগবান

বৈজ্ঞানিক যে নাস্তিকই হবেন তার কোন মানে নাই। পূর্ব্বতন কালের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—নিউটন, কেপলার, টাইকোব্রাহের কথা ছেড়ে দিলেও, আধুনিক যুগে ও জগতে পর্য্যন্ত এমন একাধিক বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই যাঁরা আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন—এ সম্পর্কে লজ, এডিংটন, আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক স্বনামধন্য হয়েছেন। তবে বলা হয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিক আস্তিক বা ভগবৎবিশ্বাসী হতে পারেন বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে নয়। যে বৃত্তি দিয়ে তিনি এই অতিলৌকিক সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তা বৈজ্ঞানিক বৃত্তি নয়, তা মানুষের আর একটা দিকের কথা। মানুষের সত্তা স্বভাবতঃই এই রকম দ্বিধাভিন্ন—একদিকে সে বৈজ্ঞানিক হলেও, অন্য দিকে সে অবৈজ্ঞানিকই থেকে যায়। কেবল বৈজ্ঞানিকেরা নন, দার্শনিকেরাও অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিকদের এ কথায় সায় দিয়ে থাকেন—বলেন যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে ভগবান আত্মা বা অমরত্ব, এ সব জিনিষের প্রমাণ পাই না, কিন্তু অনুভবের হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে এদের সত্য বা সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈজ্ঞানিক যে বৃত্তি দিয়ে সত্যানুসন্ধান করেন তা হল যুক্তি—মনোময় পুরুষের বিচারশক্তি। আর এই যুক্তি বা বিচারশক্তির এমন সামর্থ্য নাই যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষেত্রকে একান্তভাবে অতিক্রম করে যেতে পারে—অবশ্য যদি সে সত্যসন্ধ থাকতে চায়, নতুবা বৃথা বিপরীত চেষ্টা করলে সে গড়বে কেবল কাইমেরা (chimera), আকাশকুসুম, শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুত্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই বিসদৃশ সংযোগ বা বিয়োগ। দার্শনিক বের্গসঁ তাই বলেন—বুদ্ধিশক্তি ইন্দ্রিয়প্রতীতিকে

অতিক্রম করতে অক্ষম, কারণ বুদ্ধিশক্তির জন্ম ও স্থিতি ইন্দ্রিয়প্রতীতির ক্ষেত্রে, তথাকার একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, একটা প্রয়োজনের চাপে। বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তি হল জড়কে সুষ্ঠুতর ব্যবহার করবার কৌশল হিসাবে—বৈজ্ঞানিকেরা যে তথাকথিত বিশ্বসত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করেন তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির দৌলতে, সে সকলেরও প্রধান সার্থকতা এই যে বাহ্য-জগৎটির সাথে কারবার তারা সহজ করে ধরে। সুতরাং জড়ধর্ম্ম ছাড়া অন্য ধর্ম্মের রহস্য সম্বন্ধে সে যে অন্ধ, এ ত্রুটি তার জন্মগত ও প্রকৃতগতি। সে যা হোক, তবু বলতে হবে, বৈজ্ঞানিকের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশই হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তির বৈশিষ্ট্য যা তা সুষ্ঠুতমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সম্পদ নিয়ে, তাদের সংশ্লেষ-বিশ্লেষ, পরীক্ষণ-পর্য্যবেক্ষ করে, যতদূর সম্ভব বিশ্বব্যাপী বিধানের মধ্যে ধরে দে নিই হল বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির নিজস্ব প্রতিভা।

"বৈজ্ঞানিক উপায়ে" প্রকৃতির লীলাখেলার যে রহস্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে তার মূল্য যাই হোক প্রকৃতির রহস্যের তাই শেষ কথা বা সব কথা নয়। অবশ্য বলা হতে পারে জ্ঞানের, সত্যজ্ঞানের আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই—অন্য পন্থায় চললে কল্পনার, কবিত্বের, মায়ার, মোহের রাজ্যে পৌঁছিতে পারি কিন্তু বস্তুতন্ত্র-জগতে নয়। জ্ঞানের, সত্যানুসন্ধানের অন্য পন্থা আছে কি না সে সম্বন্ধে পরে কিছু বলব; আপাততঃ দেখতে চেষ্টা করব বৈজ্ঞানিকের পন্থা দিয়েই আরও কতদূর যাওয়া যায় কি যায় না এবং যে সব বৈজ্ঞানিকেরা এই আরো কিছু দূর গিয়েছেন, তাঁরা কোথায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তার মূল্যই বা কি।

বলেছি বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির বনিয়াদ হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং এই বনিয়াদের উপর তার সমগ্র জ্ঞান-সৌধটি প্রতিষ্ঠিত এবং এর দেওয়া ছক অমান্য বা অতিক্রম করে সে যেতে পারে না। তবুও একটা কথা আছে —এ হল জ্ঞানের বিষয় বা বস্তুর সীমা ও সীমানার কথা, কিন্তু জ্ঞানের

স্বরূপ বা স্বভাব এখানে তার সর্ব্বোচ্চ শিখরে কি ধরণের হতে পারে ? জিজ্ঞাস্য—আইনষ্টাইন বা প্লাঙ্ক যে আস্তিক্যবুদ্ধির পরিচয় দেন সেটি তাঁদের বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিরই পরিণতি, শেষ ফল, না অন্য ধরণের অবৈজ্ঞানিক একটা বৃত্তির প্রতিচ্ছায়া ? একদল গোঁড়া খাস-ইউরোপ-বাসিন্দা (continental) বৈজ্ঞানিকেরা দ্বৈপায়ন ইংরেজ-বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে যেমন বলে থাকেন যে ইংরাজের ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মবোধ অথবা শুদ্ধিবাতিক (puritanism) এমন প্রচণ্ড যে লগারিথ্‌ম ইস্তাহারের মধ্যেও এখানে ওখানে বাইবেলের দু'চারটা বোল না মিশিয়ে দিতে পারলে তাঁদের স্বস্তি হয় না।

সে যা হোক, তবুও আস্তিক বৈজ্ঞানিকেরা যে আস্তিক্যবুদ্ধি পেয়ে থাকেন তা বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিরই সহজ স্বাভাবিক পরিণতি হতে পারে—অন্য কোন আদিম অযৌক্তিক বৃত্তি থেকে তার উৎপত্তি যে হবেই তা নয়। বৈজ্ঞানিকের খাঁটি বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি ও আস্তিক্য-বুদ্ধি সমপর্য্যায়ের জিনিষ—উভয়ের আছে একটা সাজাত্য। নির্জ্জলা ধর্ম্মবোধ বা আধ্যাত্মিকপ্রবণতা দেয় যে আস্তিক্যবুদ্ধি আর বৈজ্ঞানিকের নিজস্ব যে আস্তিক্যবুদ্ধি এ দুয়ের রঙে ও ঢঙে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির মধ্যে নিছক যুক্তির দিকটা যে সবচেয়ে বড় কথা তা নয়—বুদ্ধি-শক্তির নিজস্ব ওজন বা মূল্যের দিক দিয়ে। যুক্তি, সিদ্ধান্ত, তথ্য, এসব বিজ্ঞানের প্রয়োজন, উপকার, লাভ বা বস্তুর দিক, তার হাড়মাংসের দিক ; কিন্তু ঐ বুদ্ধিরই আর একটা দিক আছে যা হল অশরীরী, ফলের নয় সৌরভের দিক, বস্তুর নয় আভার দিক। কি সেটি ? নানা বৈজ্ঞানিক তাকে নানা কথায় ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু জিনিষটি মোটের উপর একই। প্রকৃতিতে, প্রকৃতির জড়-অঙ্গকে ওজন করে, মেপে-জুখে, যুক্তির কাঠগড়ায় ফেলে বৈজ্ঞানিকের প্রয়াস হয়েছে জ্ঞান আহরণ করতে, সত্যকে লাভ করতে, বাস্তবকে অধিকার

করতে; কিন্তু যে জিনিষটি প্রথমে যদি ব্যক্ত নাই থাকে, ক্রমে ফুটে উঠেছে, তাঁকে পেয়ে বসেছে, হয়ত বা গোড়া হতেই আছে অন্তরালে গুপ্ত প্রেরণারূপে, তা হল—অতল রহস্যের বোধ, একটা অসীমতার আনন্ত্যের স্পর্শ, একটা 'কিমিব কিমিব', 'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি'-ধরণের কিছু, একটা অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য অথচ কেমন জাগ্রত সত্তার আভাস—তাকে কেউ বলছেন পরম সমন্বয়, কেউ বলছেন সমুচ্চ বিধান বা বিধি, কেউ বলছেন পরম যুক্তিবত্তা, কেউ বলছেন চিন্ময়তা। এ সকল বোধ, অনুভব, প্রতীতি অবশ্যই তাঁর খাস বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তাকে যেন ঘিরে রয়েছে চারদিক থেকে একটা সূক্ষ্ম আবহাওয়ার মত, একটা আভামণ্ডলের মত—এখান থেকেই আসছে যেন তাঁর গবেষণার প্রেরণা, ইঙ্গিত, সত্যদৃষ্টি। বলি না—সকল বৈজ্ঞানিকেরই এই সম্পদ—এই উন্মুক্তি—রয়েছে, অনেকেই হয়ত কেবল তথ্যসং-গ্রাহক, তালিকাকার—কিন্তু যাঁরা সত্যকার আবিষ্কার করেছেন কিছু, প্রকৃতির অবগুণ্ঠন অপসারিত করতে পেরেছেন একটু, তাঁদেরই মধ্যে দেখতে পাই এই যুক্তির অতিরিক্ত একটা বেশি-কিছুর সুরভি ও আভা। কেপলার যখন তার দূরবীনটি ধরে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন, নিরীক্ষণ করছেন গ্রহরাজির গতিবিধি, তন্ময় হয়ে গিয়েছেন একটা বিপুলের, অনন্তের, আশ্চর্য্যময়ের, রহস্যময়ের অনুভবে তখনই কি এক শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ বিলসনের মত খেলে গেল না তাঁর এই মহা-আবিষ্কার যে গ্রহদের গতিপথ হল বৃত্তাভাস (এবং সূর্য্য সেই বৃত্তাভাসের এক কেন্দ্রে)? নিউটন সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে যে, আপেল ফল গাছ থেকে পড়তে দেখে তিনি মাধ্যা-কর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন—এও কি সেই একই রহস্য নয়?

ফলতঃ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কেবল বা প্রধানতঃ যে যুক্তি দিয়ে আবিকৃত হয়, এটি একটি ধারণা বা সংস্কার মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে

হয়ত মনে করেন—এ রকম হওয়া উচিত এবং অনেকে হয়ত বিশ্বাসও করেন যে, বাস্তবিক এ রকম ঘটে থাকে—কিন্তু সত্য ব্যাপার তা নয়। আবিষ্কার অর্থই যবনিকার অপসারণ এবং আকস্মিক অপসারণ—যুক্তি পরে এসে আবিষ্কৃত সত্যকে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করে, বড়জোর হয়ত এদিক ওদিক একটু অদল-বদল করে, যোগ-বিয়োগ করে,পরিচ্ছিন্ন যথাযথ করে ধরে। সকল জ্ঞানে, সকল সিদ্ধান্তে এই যুক্তিবহির্ভূত অপরোক্ষ, আন্তর একটা অনুভব বা বোধ বা প্রতীতিই দিয়ে থাকে যুক্তির অবয়বে তার মুখ্য সূত্রটি বা স্বতঃসিদ্ধটি (major premiss)।

কিন্তু তবু বলতে হয় বুদ্ধির, বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিরও এই যে সূক্ষ্মতম ঊর্দ্ধতম ধারা তার মধ্যে আস্তিকতার, আধ্যাত্মিকতার বা ধর্ম্মবোধের আমেজ যা বা যতটুকু থাকুক না, তা পুরোপুরি বা খাঁটি অধ্যাত্মবস্তুটি হয়ে উঠতে পারেনি। অনেক দার্শনিকও হয়ত আরো সহজে ঐ একই রকম একটা অনুভবের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন। দার্শনিক স্পিনোজা আর বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন যে আনন্ত্যের বোধ পেয়েছেন তা প্রায় এক ধরণের, এক পর্য্যায়ের—কেমন নির্বস্তুক, তত্ত্বমাত্রিক (abstract), গাণিতিক অনন্ত, তা হল যেন x। বৈজ্ঞানিক তাঁর বুদ্ধির শিখরে উঠেছেন বহিরিন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধায়ণের ফলে, দার্শনিকও অনুরূপ পন্থায় চলেছেন তবে তাঁর মানস-ধারণার (conceptual ideation) একটা ঊর্দ্ধায়ণের ফলে। উভয়েই কিন্তু বুদ্ধির সীমানা, মস্তিষ্কের ঘেরটি অতিক্রম করতে পারেন নাই—সত্যকার অধ্যাত্মজ্ঞান বা অধ্যাত্মবোধ হল ঠিক এই সীমানা অতিক্রম করায়—তন্ত্রের ভাষায় যাকে বলে ষট্‌চক্রভেদ। স্পিনোজার amor intellectualis বৈজ্ঞানিক আস্তিক্যবোধেরও সূত্র হতে পারে, কিন্তু তা অধ্যাত্মের কোঠায় পৌঁছে নাই।

একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার কতজন সত্যসত্য লক্ষ্য করেছেন জানি

না, তা হল এই—বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি-অনুপ্রাণিত, যুক্তিবাদী আধুনিক মন যখন ধর্ম্ম বা অধ্যাত্মসত্যের দিকে যে কারণে হোক ঝুঁকেছেন, তখন দেখি প্রায়ই তা আকৃষ্ট হয়েছে বেদান্ত বা বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের দিকে।* এর মুখ্য কারণ আমার মনে হয় এই—ধর্ম্ম বলতে সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ এমন কতকগুলি সত্য ও তথ্য বুঝায় বৈজ্ঞানিকেরা যাদের "মানবতা-পরিচ্ছিন্ন" (anthropomorphic) এই বিশেষণ দিয়ে থাকেন। বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এই জিনিষটি বরদাস্ত করতে পারেন না। কারণ, বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই হল ঠিক মানুষ-জিনিষটিকে মানুষের জ্ঞান থেকে পৃথক করে সরিয়ে রাখা—বিশিষ্ট জ্ঞাতার হয় বিশিষ্ট জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ জ্ঞানই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এখন বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি তার চরমে পৌঁছে বলছে, "এর পরে কি আছে জানি না, তা অজ্ঞাত অজ্ঞেয়"—এই বিজ্ঞ-অজ্ঞতা, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদ, যার রকমফের সংশয়বাদ, তাই হল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ন্যায্য পরিণাম। কিন্তু এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে একটু শ্রদ্ধালু হয়ে, একটু আস্তিক্যবুদ্ধি নিয়ে দেখলেই বলা চলে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ"—এই বুঝি অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্ম, এরই আর এক নাম তবে শূন্য। মন বুঝতে পারে মনকে, আর না হয় মনের ধ্বংসকে—উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী কিছুকে সম্যক্ ধারণ করা তার পক্ষে দুরূহ। বিচারবুদ্ধির পক্ষে অধ্যাত্মের নেতি-তত্ত্ব গ্রহণ করা তত কঠিন নয়, যত কঠিন অধ্যাত্মের অন্যবিধ তত্ত্ব—সাকার-তত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব, পুরুষোত্তম-তত্ত্ব, এমন কি পুনর্জন্ম-তত্ত্ব। বৈদান্তিকের সৎ-চিৎ-আনন্দ এমন একটা সর্ব্বসাধারণ তত্ত্ব, এমন একটা নিরপেক্ষ নির্ব্বিশেষ বস্তু যাকে বুদ্ধি

* ভারতে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ এনেছেন রামমোহন—তাঁকেও দেখি বৈদান্তিক (উপনিষদ) সিদ্ধান্তের উপরই জোর দিতে, বৈদিক সিদ্ধান্তের উপর নয়।

প্রায় অনুভব করে, স্পর্শ করে যখন সে তার আপনার সীমানার কাছে উঠে দাঁড়ায়। অন্য কথায়, মস্তিষ্কের মধ্যে, তার ঊর্দ্ধতম স্তরে, অধ্যাত্মের প্রথম প্রকাশ, আভা, প্রতিচ্ছবি হল এই রকম একটা অশরীরী অনন্তের বোধ যে অনন্তের স্বরূপ হল সৎ কি চিৎ কি আনন্দ, কি তিনটিই যুগপৎ অথবা অসৎ-কিছু যার মধ্যে কিন্তু রয়েছে সকল সৎ।

বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি এই রকমে আস্তিকতার এক দিকে পৌঁছেছেন—ঠিক অনুরূপ স্তরে আর এক দিকে পৌঁছেছেন কবি ও শিল্পী। শিল্পীর রসানুভূতি, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে একটা নিবিড় সৌন্দর্য্যের আনন্দের বোধ, যদিও তা বুদ্ধিজাত বস্তু নয়, তবুও তা বুদ্ধির সগোত্র, তা মানসরাজ্যের কথা—চেতনার যে সীমানা পার হয়ে গেলে আমরা পৌঁছি অধ্যাত্মলোকে সে সীমানার এদিককার কথা, হয়ত তা ঠিক সীমান্তের বিষয়, তবুও তার সুর, তার ভঙ্গী, তার চলন-বলন এ পারেরই—তার আস্পৃহা যতই থাক ওপারের দিকে। অবশ্য আমি বলছি সাধারণ শিল্পীদের কথা, শিল্পীদের সাধারণ সৃষ্টির কথা—এমন শিল্পী আছেন, শিল্পীর এমন সৃষ্টি আছে যাঁর ও যার মধ্যে সত্যকার আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তা স্বতন্ত্র কথা—আধ্যাত্মিক শিল্পের কথা। সাধারণ শিল্প সে পর্য্যায়ের নয়, তার অনুপ্রেরণা অন্য ধরণের। সেইভাবে দর্শনও আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকাশ হতে পারে—এধরণের দর্শন ও দার্শনিক বিরল নয়। ভারতীয় দর্শন বেশির ভাগই এই পর্য্যায়ের। শাঙ্কর বা রামানুজীয় দর্শন, সাংখ্য বা পাতঞ্জল, এক একটি আধ্যাত্মিক দর্শন বা দৃষ্টিরই বুদ্ধিগত ব্যাখ্যামাত্র। তাই যদি হয়, তবে এমন কথা কি বলা যেতে পারে না যে বিজ্ঞানও হয়ে উঠতে পারে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই প্রকাশ বা বাহন? এ পর্য্যন্ত হয়ত হয় নাই, হয়ত বা এ ধারায় একটা চেষ্টা হয়েছিল যাকে বলে গুপ্তবিদ্যা বা মন্ত্রবিদ্যা, এমন কি প্রাচীনেরা যাকে বলত রসায়নবিদ্যা, তার

মধ্যে—যদিও এদের শেষ পরিণতি নিবিড় কুসংস্কারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়েছিল। অবশ্য এ ধরণের বিদ্যাকেও অপরাবিদ্যাই বলা হয়, পরাবিদ্যা নয়—তা হলেও অপরাবিদ্যাকে পরাবিদ্যারই সোপান, বাহন বা প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এক সময়ে—অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

কিন্তু অতীতে যাই হোক আধুনিক 'জড়তম'-বিজ্ঞানের—ঘোর অপরা-বিদ্যা—পরাবিদ্যার সাথে সাক্ষাৎভাবে এবং পূর্ণতর ভাবে সংযুক্ত হতে পারে তার সম্ভাবনা আদৌ আছে কি—থাকলে কোন দিকে ? আমরা অন্যত্র বলেছি এ সম্ভব হবে তখনই যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সত্যানুসন্ধানের জন্যও বাস্তববস্তু ও ঘটনা আমরা নিরীক্ষণ করতে, আহরণ করতে শিখব কেবলই স্থূল ইন্দ্রিয়ের সহায়ে নয় পরন্তু সূক্ষ্মতর আন্তর ইন্দ্রিয়েরও সহায়ে ; আর সে সূক্ষ্মতর আন্তর ইন্দ্রিয় সক্রিয় হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই যখন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি মনোময় দৃষ্টি হতে উন্নীত রূপান্তরিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে আত্মার, অন্তরাত্মার প্রজ্ঞানময় চেতনায়।

উত্তরা, ভাদ্র, ১৩৫৭

বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের একজন সচেতন নির্ম্মাতা যে আছে, এক সময়ে তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ-হিসাবে দেখান হ'ত জগতের নির্ম্মাণ-কৌশল। একটা ঘড়ি যদি দেখি, দেখি তার বহুল কলকব্জা, কি রকমে তারা সব সাজান গোছান রয়েছে, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার, কত জটিল গতি তাদের, অথচ পরস্পরে মিলে কি অপরূপ সামঞ্জস্যে চ'লে একই উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত। তখন তা থেকে অব্যর্থভাবে সিদ্ধান্ত করি, ঘড়ি-নির্ম্মাতার অস্তিত্ব, যার বুদ্ধির নৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়েছে তার নির্ম্মিত বস্তুতে। জগৎ কি ঠিক সেই রকম একটা চমৎকার যন্ত্র নয়?

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কেমন অব্যভিচারী নিয়মে পরস্পরের সম্বন্ধ অটুট রেখে কোটি কোটি বৎসর ধরে চলেছে, ঋগ্বেদীয় ভাষায়, তারা মিশে যায় না, থেমেও পড়ে না—ন মেথতে ন তস্থতু। আর যে নিয়মে তারা চলছে, বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমরা যা আবিষ্কার করেছি, তা কি অপরূপ গাণিতিক নিয়ম। বৃহৎকে ছেড়ে ক্ষুদ্রের মধ্যে দেখ—দেখ দানা-বাঁধার জ্যামিতি, পরমাণুর মধ্যে চ'লে যাও, দেখ প্রোটন ইলেকট্রনের ছক সব, কোথায় লাগে তার কাছে তাজমহলের স্থাপত্য-কৌশল!

একটি ফুলের মধ্যে—তার বোঁটা পাপড়ী, তার গর্ভকোষ রেণু পরাগ, তার রঙের মেলা, রেখার সমাবেশ—সেখানে কি যে নিখুঁৎ নিপুণ কারিগরী রয়েছে তার উপরে একটু ধ্যান দিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। ফুল তারপর কি রকমে ফলে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে—ফল ধীরে

ধীরে কি রকম পুষ্ট পরিণত রসায়িত হয়ে এক সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করছে, সে ইতিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

আবার দেখ এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যাতীত তৃণগুল্ম তরুলতা, তাদের জীবন কত বিচিত্র কত বহুরূপ—দেশে দেশে মাটির আবহাওয়ার সাথে অপরূপ সামঞ্জস্য রেখে তারা কত আকারে প্রকারে দেখা দিয়েছে। মরুভূমিতে থাকতে হবে তৃণের, দেখ কি শক্ত সমর্থ আভরণহীন বাহুল্য-বর্জিত তপস্বীর মত তার গঠন—কত অল্প জলেই তার প্রয়োজন মিটে যায়, তার শীষ, তার শিকড়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব ঐ এক লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত হয়েছে। শীতপ্রধান দেশের, সাইবেরিয়ার 'লিচেন' আবার তার নিজস্ব পরিস্থিতির সমতালে চলবার জন্য পৃথক ধরণধারণ গ্রহণ করেছে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের গুল্ম হতে মহান মহীরুহ আবার তৃতীয় পর্য্যায়ের ব্যবস্থা দেখায়। প্রাণীজগতে দৃষ্টি দাও—জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর প্রত্যেকের দেহখানি গঠিত হয়েছে আপন আপন পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন অনুসারে। এই যে প্রয়োজন অনুসারে বৈষম্য এর মধ্যে যে কতখানি পরিমিতি-শাস্ত্রজ্ঞান রয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। পরিমিতি অর্থ প্রয়োজন অনুসারে আয়োজন—অযথা ব্যয় নাই, শ্রমের কি উপকরণের। মাছকে জলে থাকতে হবে, চলতে হবে—জলের চাপ সহ্য করার মত ক'রে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুত হয়েছে, সাজান হয়েছে, জলের চাপ কেটে দ্রুত চলবার জন্য তার বিশিষ্ট আকারও দেওয়া হয়েছে (যার নকল করে মানুষ সাবমেরীন টরপেডো তৈরী করেছে)। পাখীকে আকাশে উড়তে হবে—যে জিনিষ ভর করে সে উড়বে তার ওজন হওয়া চাই অল্প, আবার গঠন হওয়া চাই দৃঢ় অথচ নমনীয়। পাখীর ডানার কলম দেখ—তার হালকা হওয়া চাই—তাই সে ফাঁপা আবার পাতলা অথচ দৃঢ়, বাঁকে কিন্তু ভাঙ্গে না। মানুষের তৈরী এরোপ্লেন ঠিক এই সব বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান

আর সব ছেড়ে যখন নিজেকেই দেখি, দেখি মানুষের দেহ—কি অপরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সেটি। সত্য সত্যই একটি বিপুল জটিল কারখানা সে। মানুষ নিজে যে যন্ত্র—তার তুলনায় মানুষের তৈরী যন্ত্র সব অকিঞ্চিৎকর। অস্থির সংস্থান, পেশীর সংস্থান, গ্রন্থীর সংস্থান, স্নায়ুমণ্ডলীর সমাবেশ, রক্তের চলাচল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কলা-কৌশল, জারণ সারণের ব্যবস্থা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ—পদার্থতত্ত্বের রসায়নতত্ত্বের কত রকমে প্রয়োগ-ক্ষেত্র এই দেহ—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যখন বস্তুটিকে দেখি তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে এ বস্তু আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে, নাই এর একজন পরমনিপুণ সচেতন কারিগর।

এক সময়ে তাই মনে হ'ত, জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রী হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না মেনে নিয়ে আর উপায় নাই। চার্ব্বাকপন্থীরা, লোকায়তেরা অবশ্য ছিলেন—কিন্তু তাঁদের অস্বীকৃতির বিশেষ মূল্য ছিল না। কারণ, তাঁরা এক রকম যাকে বলে গায়ের জোরে অস্বীকার করতেন, অস্বীকারের যথাযথ যুক্তি দিতেন না। সৃষ্টি আপনা থেকেই আপনি হয়েছে, আপনিই চলেছে, প্রকৃতির যে যন্ত্রপাতি কলকব্জা তার মধ্যে রহস্য কিছু নাই, প্রকৃতির প্রকৃতিই এই—স্বভাবো যদৃচ্ছা। এ ধরণের কথা বললে কিছুই বলা হয় না। (অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ—বৌদ্ধেরা, সাংখ্যপন্থীরা—ঈশ্বর মানেন না বটে ; কিন্তু তাঁরা চিন্ময় পুরুষ বা চিন্ময়ী প্রকৃতি বা চিন্ময় পুরুষের সংসর্গে চেতনাবান প্রকৃতি মানেন।)

কিন্তু বিজ্ঞানের যুগ নিয়ে এল এক নূতন রূপ আলো। মানুষের এক নূতন দৃষ্টি খুলল, তার কল্যাণে সৃষ্টিরহস্যের সকল রহস্য সহজ স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারল। সৃষ্টির অতীত এক যাদুকরের (Deus ex machina) আর কোন প্রয়োজন রইল না। লামার্ক-ডারউইনের ক্রমপরিণামবাদ সৃষ্টিধারার মধ্যে ফেললে এমন আলো যে,

সব সমস্যাই আপন আপন সরল অব্যর্থ মীমাংসা নিয়ে পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল। তাঁদের আবিষ্কারের ফলে মোট কথাটি দাঁড়াল এই—সৃষ্টির মধ্যে যে অদ্ভুত লক্ষ্যানুসরণ, উদ্দেশ্য অনুযায়ী যথাযথ উপায় নির্দ্দেশ, অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার সমাবেশ দেখি—তার কারণ ও-জিনিষটি এক ক্রমপরিণামের ধারায় নির্ব্বাচন ও উদ্বর্ত্তনের অলঙ্ঘনীয় ফল মাত্র। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সজীব দেহের, দেহের ও নিজের অঙ্গ-সকলের পরস্পরের মধ্যে যে জটিল ছন্দ-সৌষীম্য, সৃষ্টির সর্ব্বত্র যে এত কলকৌশল তা একদিনে দেখা দেয় নাই, প্রথমে তা এত বিচিত্র এত নির্দ্দোষ ছিল না। প্রথমে একটা মোটামুটি ধরণের, একটা কোন-রকমের ব্যবস্থা মাত্র ছিল, সংস্পর্শের সংঘর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আদানপ্রদানের ফলে ধীরে ধীরে এই সামঞ্জস্য এই লক্ষ্যানুগত্য—বস্তুর উদ্দেশ্যানুযায়ী গঠন ও ক্রিয়া ফুটে উঠেছে। জীবনধারণের কঠোর প্রয়োজনের চাপে জীব-জগতে জড়দেহে এই অপরূপ যন্ত্র গড়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে যারা বেঁচে-বর্ত্তে আছে—উদ্ভিদ্ হোক্, প্রাণী হোক্, আর মানুষ হোক—তারা বেঁচে-বর্ত্তে আছে ঠিক এই জন্যেই যে, তারা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, তাদের আধার—তাদের গঠন ও কর্ম্মসামর্থ্য দেহের বহুদিনের বহুযুগের একটা বাছাই-যাচাই-এর ফলে প্রস্তুত হয়েছে। অপটু আধার যত নষ্ট ও লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যেখানে পটুতা দেখা দিয়েছে, বাড়তে পেরেছে—সেখানেই উদ্বর্ত্তনের সম্ভাবনা হয়েছে। উদ্ভিদ্ থেকে প্রাণী, প্রাণী থেকে মানুষও এই রকম একটা সুষ্ঠু হতে সুষ্ঠুতর, সরল সামঞ্জস্য থেকে বহুমুখী সামঞ্জস্যের দিকে ক্রমগতির পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে যে যন্ত্রকৌশল দেখতে পাই সেটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চাপে, বাছাই-ছাঁটাইর ফলে অব্যর্থভাবে দেখা দিয়েছে, অন্যপ্রকার হওয়ার কোন অবসরই এখানে ছিল না। পার্ব্বত্য নদীর স্রোতে ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে উপলখণ্ড যেমন মসৃণ গোলাকার হয়, পায় একটা

সুষীম রূপ, ব্যাপারটি সেই রকমের। প্রকৃতি নিজের ভিতর থেকেই যন্ত্র হয়ে গড়ে উঠেছে, বাহিরের কোন যন্ত্রীর হাত এখানে প্রয়োজন নাই।

প্রকৃতি-রূপ যন্ত্র এইভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি হতে বহিষ্কার করে দিয়েছেন—লাপলাস তাঁর সৃষ্টির মানচিত্রে স্রষ্টার বা ভগবানের জন্য কোন স্থানই খুঁজেই পান নাই; তার কিছু প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সৃষ্টির স্রষ্টা, যন্ত্রের যন্ত্রী যদি কেউ কোথাও থাকে তবে তাঁর উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক বলেছে সে অজ্ঞেয়, আমাদের পক্ষে নাস্তি।

বিজ্ঞান সৃষ্টি-সমস্যার এই মীমাংসা পেয়ে ও ধরে কিছুদিন বেশ নিশ্চিত ছিল—কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও ফাঁক দেখা দিতে সুরু করল, সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে আসতে লাগল। নূতন নূতন তথ্যের ঘটনার ব্যাপারের আবিষ্কার পূর্ব্বতন মীমাংসাকে টলিয়ে দুলিয়ে দিল। এই যেমন মীমাংসা হয়েছিল, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিল যে জীবন-ধারণের পক্ষে আধারে যে পরিবর্ত্তনটি কাজে লাগে সেইটি বর্ত্তে যায় ও ক্রমে পুষ্ট হতে থাকে—এবং অনুপযোগী যা তা ক্ষয় পেতে থাকে, লোপ পেয়ে যায় শেষে। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন, গোড়ায় যে পরি-বর্ত্তন হঠাৎ দেখা দিল তা সামান্য অকিঞ্চিৎকর, তখন তার উপযোগিতা ত প্রমাণ হয় নাই, উপযোগিতা প্রমাণ হয় যখন পরিবর্ত্তনটি পূর্ণ, যথেষ্ট পরিণত হয়েছে। লামার্কের তত্ত্ব মানলে বলতে হয়, পরে কাজে লাগবে এই ভবিষ্যতের আশায় বা পূর্ব্বদৃষ্টির আশায় সামান্য পরিবর্ত্তনটি বর্ত্তে থাকে ও বেড়ে চলে। কিন্তু এ ত আদৌ যান্ত্রিকতাব ধর্ম্ম নয়—এ ত চৈতন্যের ধর্ম্ম। তাই এই সঙ্কট হতে উদ্ধার লাভের জন্য আকস্মিক বৃহৎ-পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব (mutation) আবিষ্কার করা হল। কিন্তু তাতেও সব মুস্কিলের আসান হ'ল কি? বাস্তব বস্তুর ও ঘটনার পর্য্য-বেক্ষণ ও পরীক্ষণ যত বিস্তৃত হতে লাগল, দেখা গেল ফলে যে দূর, সুদূর ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, বর্ত্তমানে তার কোনই প্রয়োজন নাই,

এ রকম ব্যবস্থা জীবদেহে বা জীব ও তার পরিস্থিতির সম্বন্ধের মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। কেবল যন্ত্রের মত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে এ রকম ব্যবস্থাও যে গড়ে উঠেছে তা স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। বেশি কথা কি, যখন চিন্তা ক'রে দেখি, অণু পরিমাণ একটি বীজকোষের মধ্যে সমগ্র মহীরুহটি কি প্রকারে লীন হয়ে থাকে, একই মাটির একই আহার্য্যে একটি বীজকোষ আপনাকে বিপুল অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত করে, আর একটি সামান্য লতা বা গুল্মের পরিমাণ অতিক্রম করতে পারে না, কয়েক জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে জীবদেহের, জীবচরিত্রের যাবতীয় বৈচিত্র্য সম্পুটিত থাকে—তখন বীজকোষ যে শুধু একটা জড়-যন্ত্র মাত্র, রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র মাত্র এ সিদ্ধান্ত শুধু জোর জবরদস্তি ক'রেই করতে হয়।

কেবল জড়শক্তির ক্ষেত্রে যাই হোক—সে কথা পরে বলছি—জীবনীশক্তির ক্ষেত্রে যে একটা পূর্ব্বানুভূতি, উদ্দেশ্যপরায়ণতা, লক্ষ্যাভিমুখী গতি, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য বর্ত্তমানেই আয়োজন—এ সকলের উদাহরণ যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, তা আজকাল আর অগ্রাহ্য করা চলে না। প্রাণশক্তির খেলাকে কেবলই জড়শক্তির কথা দিয়ে সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভবই। মনের জগতে (বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে এবং কথঞ্চিৎ হয়ত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে) সচেতন ইচ্ছাশক্তি প্রকট। প্রাণের, জীবনীশক্তির জগতে ইচ্ছাশক্তি সচেতন হয় নাই, কিন্তু তাই বলে নাস্তি নয়। মানস ইচ্ছাশক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নতন প্রাণীর এবং উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে প্রাণজ ইচ্ছাশক্তি। মানবেতর উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে প্রাণজ ইচ্ছাশক্তিই প্রধান, তবে তার মধ্যে মানস ইচ্ছাশক্তির ন্যূনাধিক আবেশ হয়েছে। প্রাণজ ইচ্ছাশক্তি-অধিকৃত মানস-ইচ্ছাশক্তিরই নাম হল পশুসুলভ সহজাত প্রেরণা (instinct)। উদ্ভিদের মধ্যে মনের কোনই

আবেশ নাই, সেখানে বিশুদ্ধ অমিশ্র প্রাণজ ইচ্ছাশক্তি। উদ্ভিদের যে বৃত্তিকে বলে "আভিমুখ্যতা" (tropism) অর্থাৎ যেদিকে আলো বা আহার্য্যের বা অবলম্বনের সম্ভাবনা সেদিকে মাঝে বাধা সত্বেও ঘুরে বেঁকে চলা, সে ব্যাপারটি উদ্ভিদের প্রাণজ ইচ্ছাশক্তির অপূর্ব্ব পরিচয়।

তবে জড়স্তরে, বিশুদ্ধ জড়স্তরে কোন রকম ইচ্ছাশক্তির চিহ্ন কিছু পাওয়া যায় কি? জড়জ ইচ্ছাশক্তি যদি থাকে, কি ধরণের বস্তু তা? অবশ্য জড়ের আকর্ষণ বিকর্ষণকে এই ধরণের শক্তি অনেকে বলেন—কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তা মানবেন না, বলবেন এ কেবল কবিতা, উপমা, pathetic fallacy, ইচ্ছাশক্তির খেলার মধ্যে একটা নির্ব্বাচন বা নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা থাকা চাই, দ্বৈতভাবের অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকা চাই—নতুবা জিনিষটি একান্ত যন্ত্র, সর্ব্বতোভাবে নিয়মের বাধ্য ও বদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান জড়ের এমন একটা স্তরে আমাদের নিয়ে গিয়েছে যেখানে জড়ের আচার-ব্যবহার অপ্রত্যাশিত রকমের হয়ে গিয়েছে—এবং সে যে যন্ত্রবৎ নিয়মবদ্ধ, তার গতির মধ্যে দ্বৈতভাবের অনিশ্চয়তার কোন অবকাশ নাই একথা আর বলা চলছে না। জড়ের যে ক্ষুদ্রতম খণ্ড—বৈদ্যুতিক কণা—ব্যষ্টি-হিসাবে তার গতিবিধি নির্ণয় করা হয় না—প্রত্যেকে যে কোন পথে চলবে না চলবে কোন রকম হিসাব-নিকাশ ক'রেও তা আবিষ্কার করা যায় না, বলতে ইচ্ছা হয় তারা খোস-মেজাজী খেয়ালী ; তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ গতিবিধিকেই কেবল নিয়মের মধ্যে বাঁধা যায়। শুধু তাই নয়; আরও বিস্ময়ের কথা আছে। বৈদ্যুতিক কণাও নাকি সকল যান্ত্রিক ধর্ম্ম ও নিয়ম অগ্রাহ্য ক'রে সম্মুখে বাধা সত্বেও বাধাকে ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে যায় দূরস্থ তার সহধর্ম্মীর সাথে মিলবার জন্য।*

* পাছে আপনারা মনে করেন যে, আমি রূঢ় বিজ্ঞানের কথা না ব'লে উপন্যাস রচনা করেছি, তাই বৈজ্ঞানিকের নিজের ভাষা এখানে উদ্ধৃত করলাম; যদিও বৈজ্ঞা-

এ ধরণের গতি বা বৃত্তিকে আমরা ইচ্ছাশক্তির পর্য্যায়ে ফেলতে চাই না, কারণ ইচ্ছাশক্তি অর্থে আমরা বুঝি প্রধানত মানস ইচ্ছাশক্তি— প্রাণজ ইচ্ছাশক্তি একটু কল্পনা ক'রে বুঝলেও বুঝতে পারি, জড়জ ইচ্ছাশক্তি আমাদের কল্পনার ধারণার অতীত।

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে ক্রমপরিণাম বা বিবর্ত্তন যদি সত্য হয়, তবে আমাদের সাহস ক'রে ঐ ধরণের বস্তুকে অস্বীকার করাও সমীচীন হবে না। বিবর্ত্তনের যত নিম্নস্তরে নেমে আসি চেতনার প্রকাশ তত হ্রাস পেতে থাকে। মানুষের যে বৃত্তি স্পষ্ট স্ফুট নিঃসন্দেহ, মানুষেতর উচ্চতর প্রাণীতে তার উপর পরদা পড়তে, তার নিমীলন হতে সুরু

নিকট হলেন "প্রাণ-বৈজ্ঞানিক" মাত্র, একেবারে আদি অকৃত্রিম "জড় বৈজ্ঞানিক" নন:
"One of the most amazing features of quantum mechanical theory is the discovery that electrons and other elementary particles will leak through a potential barrier which they could never cross if the classical physics were true. The electron is imprisoned, for example, in a metal filament and would gain Kinetic energy like a stone rolling downhill, if it could cross a gap to a positively charged plate. But to leave the metal it has to traverse a potential barrier at the surface of the filament and does not possess the requisite energy. According to the classical physics, it is like a stone in a small depression on a hill side, which cannot get out so to roll down the hill. There is no force acting on the electron or the stone which will take them over the barrier. But such an electron does go out, though the stone does not."

The Marxist Philosophy and the Sciences by J. B. S. Haldane pp. 145—146.

হয়েছে, নিম্নতন প্রাণীতে তা ক্ষীণ, উদ্ভিদে তা সন্দেহের বিষয়, জড় পদার্থে তা একেবারে লীন বা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। তবে কথা এই, লীন বা আচ্ছন্ন হয়েছে বলে সে বস্তু যে লয় বা লোপ পেয়েছে, আদৌ নাই, তা নয়। নিম্নতম স্থূলতম জড়ের মধ্যেও চেতনা ইচ্ছাশক্তি রয়েছে—তবে তা সুপ্ত, অন্তর্লীন, অন্তর্গূঢ়—এবং সেই অবস্থাতেও পশ্চাৎ হতে তার একটা নিভৃত চাপ বাইরের ক্রিয়াকলাপের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করবেই, বাইরের রূপকে কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত করবেই। বৃক্ষের বল্কল, দেহস্থ কেশ বা নখ পৃথক ক'রে দেখলে মৃত জড় পদার্থ মাত্র, কিন্তু জীবন্ত বৃক্ষের ও দেহের জীবনীশক্তি যখন পিছনে, তার চাপে তখন এরা সজীব, এদের ব্যবহারে সজীবতার ধর্ম্ম দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটি কতক এই ধরণের।

আলোর পশ্চাতে—আলো হ'ল জড়ের সবচেয়ে কম মাত্রার জড় রূপ—যেমন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রগত চাপের অস্তিত্ব বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে, সেই রকম—আরও এগিয়ে যদি যেতে পারি তবে দেখি, এই জড় চাপের পশ্চাতেও রয়েছে একটা চেতনা অর্থাৎ অবচেতনার চাপ। সেটি অবশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বিষয় নয়—তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বিষয় করবার চেষ্টাও যুক্তিযুক্ত নয়; কারণ সেটি হল আরও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়াতীত, চিন্ময় দৃষ্টির বিষয়। আজকাল force (বল)-কে ছেড়ে field (ক্ষেত্র)-এর কথা বেশি বলা হয়। বোধ হয় তেজকে ছেড়ে বিজ্ঞান মরুৎকে আশ্রয় করতে চলেছে—কিন্তু তারও আগে রয়েছে ব্যোম—চিদাকাশ।

জড় প্রকৃতির, একান্ত জড়ের মধ্যে—তা মহতো মহীয়ান জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী হোক, আর অণোরণীয়ান পরমাণু হোক—সর্ব্বত্র একটা যে অপরূপ শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, ছন্দায়িত গতি, তাল মান রয়েছে তা খুবই স্পষ্ট। সকলেই জানে, আমরাও বলেছি, বস্তুর পরস্পরের

সম্বন্ধে, তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়, তাদের আণবিক গঠনে, ওজনে পরিমাণের অর্থাৎ সংখ্যার যে নিয়মিত ধারা ছক বা প্যাটার্ন পাই তা বড়ই আশ্চর্য্যের। বস্তুর চলনের মধ্যে জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে সমতালের ও পৌনঃপুন্যের নিয়ম (law of harmonics and periodicity), বস্তুর গঠনে আবিষ্কার করছে জ্যামিতিক আকৃতি।

বলা হয় জড়বস্তুর ধর্ম্মই এই, জড় যে জড় তার প্রমাণও এই এখানে—ক্রিয়ার ধারায় একটা পুনরাবর্ত্তন, পৌনঃপুনিকতা, গঠনে একটা সমমান সমভঙ্গ হ'ল যন্ত্রের যান্ত্রিকতার লক্ষণ। দোলক দুলে চলেছে সমতালে, এতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? অবশ্য, কেবল বাইরের দিক থেকে দেখলে প্রকৃতির চলনের ও বলনের তালসাম্য মানসাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাদের সূক্ষ্মতা যথাযোগ্যতা তারিফ ক'রেই নির্ব্বাক থাকতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ যান্ত্রিকতা বিশ্লেষণ ক'রে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কলকব্জা খুলে খুলে আমরা তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে পেরেছি হয়ত—কিন্তু এমন যান্ত্রিকতার উৎপত্তি কেন হ'ল, কি রকমে হ'ল তা বুঝি না, জানি না। ক্রমপরিণামবাদ সমস্যাটির উপর কিছু আলোকপাত করেছে বটে, কিন্তু তা বাহ্যত এবং তারও সামান্য অংশ নিয়ে। বেশির ভাগই রয়েছে অন্ধকারে, কতক ভাগ আবার আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ হল পরিমাণনির্ণয়—মাপজোখ। সেদিক দিয়ে কিছু বলা যায় কি—বর্ণছত্রে সাত রং কেন, সুরগ্রামে সাতটি পর্দা কেন, পরমাণু-অন্তর্গত ইলেকট্রনেরও (ক্রিয়াশক্তি হিসাবে) সাতটি ক্রম কেন, আবার সে ইলেক্ট্রন চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা ঠিক সাতটি রকমে প্রভাবান্বিত হয় কেন ! অন্যদিকে সৃষ্টির মূলতত্ত্বের দিক দিয়ে যে সব ক্রম বা লোকের কথা আধ্যাত্মিক দ্রষ্টারা বলে থাকেন তাদেরও সংখ্যা সাত—সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ (ঋগ্বেদ), সপ্ত ইমে লোকা (মুণ্ডক উপনিষদ)।

ফলত এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়েই এ জাতীয় সমস্যার সদর্থ আমরা পেতে পারি—অন্যথা নয়। অবশ্য তাই বলে আমাদের বক্তব্য এমন নয়—মধ্যযুগে যেমন সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, বিশ্বের একজন নিপুণ চতুর স্রষ্টা আছেন, বিধাতা আছেন, যিনি তাঁর স্বষ্টির উর্দ্ধে বসে এই রকমে গুনে গুনে মেপে জুখে সাজিয়ে গুছিয়ে জগৎটাকে গড়ে তুলেছেন (কেউ কেউ বলে এ কাজটি করতে তাঁর ছয় দিন লেগেছিল—সাত দিনের দিন তিনি বসে বসে নিজের গড়া জিনিস নিজে দেখে আনন্দ উপভোগ করছিলেন—এখানেও সাতের প্রভাব !)। কিন্তু ব্যাপারটি এ রকমের না হ'লেও, এমন হওয়া অসম্ভব নয়, আমরা পূর্ব্বেই যে কথা বলেছি—যে একটা চেতনার চাপ পিছনে রয়েছে বলেই তার ছাপ বাইরে এই গোনাগুনতির কাঠামে ফুটে উঠেছে।

একটা ঘড়ির মধ্যে যে কলকৌশল (যার স্বরূপ গাণিতিক), তা হতে ঘড়িকারের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা যতই সুষ্ঠু হোক, তার চেয়ে আরও রহস্যের জিনিষ হল কলকৌশলেরই মধ্যে মনের বা চেতনার ছাপ যে বাঁধা পড়েছে সেই কথা। চৈতন্যের সংস্পর্শে জড়ও চেতনবৎ হয়ে ওঠে। ঘড়ির চেয়ে আরও জীবন্ত রচনার উদাহরণ গ্রহণ করতে পারি—একখানি চিত্র বা একটি কবিতা। কবিতার মধ্যে গণিত রয়েছে অনেকখানি, চিত্রের মধ্যেও রয়েছে বহুল পরিমাণে জ্যামিতি ; কিন্তু সে জ্যামিতি সে গণিত একটা জীবন্ত অনুভব বা চেতনার অব্যথ প্রকাশ বা সুশ্রী অবয়ব। রং-এর, রেখার, ধ্বনির বিক্ষিপ্ত পরমাণু-রাজিকে সংশ্লিষ্ট সুষীম, মূর্ত্তিমান ক'রে ধরেছে শিল্পীর চেতনার চাপ। চেতনারই ধর্ম্ম নিয়ম শৃঙ্খলা সুসংস্থান সংগঠন—অচেতনার ধর্ম্ম হ'ল বিশৃঙ্খলা বিশ্লিষ্টতা বিপর্য্যস্ততা।

বললাম চেতনার সংস্পর্শে জড়ও চেতনবৎ হয়ে ওঠে—কিন্তু কেন, কি রকমে। ও দুটি যদি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, বিভিন্ন পর্য্যায়েরই হয়;

তবে ওদের সংযোগ, পরস্পরের পরস্পরের উপর প্রভাব কি ক'রে সম্ভব ? যেমন দার্শনিক মহলে এক সময়ে সমস্যা হয়েছিল কর্তৃকারককে লাঠ্যাঘাত করা যায় কি প্রকারে ? তাই কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে একটা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা (pre-established harmony) দিয়েছেন। কেউ বা মীমাংসাকে একেবারে সরাসরি সরল ক'রে দিয়েছেন এই বলে যে, চিন্তা বা চেতনা বলে স্বতন্ত্র কিছু নাই, আছে কেবল জড়—চিন্তা চেতনা হ'ল জড়ের এক প্রকার রসস্রাব।

কিন্তু আমরা বলছি জড় যদি চৈতন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তার হেতু এই যে, জড়ের মধ্যে নিহিত।বলীন রয়েছে চেতনা। জড় হ'ল চৈতন্যের আত্মবিস্মৃত ঘনীভূত আকার।

এই সম্পর্কে একটি বিচিত্র ব্যাপার উল্লেখ করা যেতে পারে—তা হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; কিন্তু তার যে বিশেষ অর্থ কিছু আছে এমন কথা সাহস ক'রে সাধারণত কেউ ভেবেছে কি-না সন্দেহ। অনেক সময়ে একটা যন্ত্রের ব্যবহার কেমন অদ্ভুত মনে হয়। একটা ঘড়ি বা ইঞ্জিন বা নৌকা বা জাহাজ কখন কখন (যদি প্রায়ই না হয়) সজীব প্রাণীর মত চাল চলন দেখায়—যেন তাদের আছে ব্যক্তিগত খেয়াল, মেজাজ, নিয়তি। একান্ত জড় কলের ধর্ম্ম ছাড়াও তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে জড়াতিরিক্ত কিছুর, সজীব কিছুর আভাস ফুটে ওঠে। ইঞ্জিনের চালক, নৌকার মাঝি, জাহাজের সারেং (বা কাপ্তান) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে ; তারা তাদের যন্ত্রকে (বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে এ কথা আরও সত্য) জীবন্ত জিনিষ বলে বোধ করে—আর এ বোধ যে কেবলই কাল্পনিক আরোপ মাত্র তা নয়।

গুহ্যজ্ঞানের এক বিদ্যা আছে তাতে জানা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে এই জাতীয় যন্ত্র এক একটা অশরীরী সত্তা দিয়ে অধিকৃত হয়—অবশ্য যন্ত্রীর, যন্ত্রের মালিক বা চালকের চেতনাও ঐ অশরীরী সত্তার গঠনে

কিছু উপকরণ নিশ্চয়ই জোগায়, তবুও তাকে একটা স্বতন্ত্র ও সজীব সত্তা বলেই মানতে হয়। এ ধরণের সত্তা তাই বলে যে বিশেষ উচচ স্তরের সচেতন জীব আদৌ তা নয়—যন্ত্রের অনুরূপই, যন্ত্রের অনুপাতেই সে হ'ল একটা জড়ানুগত, জড়াশ্রয়ী অবচেতন শক্তি।

এ রকম আরোপের বা অধিকারের ব্যাপারটি হয়ত সাধারণ সত্য নয়—কিন্তু এ দৃষ্টান্ত থেকে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় এই যে, যন্ত্রকার যেখানে রয়েছে সেখানে যন্ত্রের মধ্যে উদ্দেশ্যানুগত্য (purposiveness) হ'ল যন্ত্রকারের চেতনার প্রতিরূপ, সেইরকম কোন যন্ত্রকারকে না দেখেও দেখি শুধু যেখানে যন্ত্রটি সেখানেও যন্ত্রগত উদ্দেশ্যানুগত্য একটা চৈতন্যের পরিচয়—সে চেতনা বহিঃস্থ কোন যন্ত্রকারের কাছ থেকে না আসলেও, তা হতে পারে যন্ত্রেরই অন্তর্গত এক প্রচ্ছন্ন আপন-হারা বা আত্মবিস্মৃত চেতনা। সমস্ত জড়সৃষ্টিকে যদি এই রকম একটা যন্ত্র-হিসাবে গ্রহণ করি তবে সেখানেও বাহ্যযন্ত্রী না হোক, এক অন্তঃযন্ত্রী, এক প্রসুপ্ত অথচ সক্রিয় ইচ্ছাশক্তির সন্ধান পাই।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও অনুভূতি বলে যে সমস্ত সৃষ্টিই হ'ল চৈতন্যের (চিন্তার নয়—ব্যষ্টিগত চিন্তার ত নয়ই) বিকাশ। আপাতপ্রতীয়মান জড়ের অন্তরেও রয়েছে চৈতন্যের অস্তিত্ব, তবে সেখানে চৈতন্য হ'ল অবচেতন অর্থাৎ সুপ্ত আত্মগুপ্ত অন্তলীন। এই অন্তর্লীন চৈতন্যের প্রচ্ছন্ন চাপেই জড়ে দেখা দিয়েছে জড়জগতের অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য ছন্দের তালের মানের শৃঙ্খলা ও নিয়ম। জীবের মধ্যে, জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় এই চৈতন্য যত সজাগ পরিস্ফুট প্রকট হয়ে উঠেছে—প্রথমে উদ্ভিদে, তারপর ইতর প্রাণীতে, শেষে মানুষে—তত আধারের যান্ত্রিক সংগঠনটি জৈবিক ধর্ম্ম অর্জন ক'রে চলেছে। বিপরীত দিকে, মানুষের মধ্যে যে চিন্ময় ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ জাগ্রত, ইতর প্রাণীতে তা

অর্দ্ধজাগ্রত, উদ্ভিদে তা স্বপ্নগত, জড়ে তা সুপ্ত—কিন্তু সুপ্ত বলে নাস্তি নয়। ঊর্দ্ধ্বতন স্তরে যা হ'ল সজাগ ইচ্ছার খেলা, উদ্দেশ্যমুখী সচেতন চেষ্টা, নিম্নতন স্তরে ক্রমে তা অনিচ্ছাকৃত, অবশ, শেষে যান্ত্রিক ব্যবহারে পরিণত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সর্ব্বত্রই রয়েছে একই চৈতন্যের চাপ, তবে বিভিন্ন প্রকারে, বিবিধ মাত্রায়—

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ—

ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৪৭

বিবর্ত্তনে যুগ-সন্ধি

প্রকৃতির মধ্যে বিবর্ত্তন অর্থাৎ ক্রমপরিণাম চলেছে, এ-সত্যটি আজকাল প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। বিবর্ত্তন বা ক্রমপরিণাম জিনিসটা কি? অল্প এবং মোটা কথায় ব্যাপারটি হ'ল এই:—বর্ত্তমানে সৃষ্টির যে চেহারা তা চিরকাল এ-রকম ছিল না; শুধু পৃথিবীর কথাই যদি ধরি তবে যত অতীতে যাই দেখি পৃথিবীর রূপ, পৃথিবীর অধিবাসীদের আকার প্রকার সমাবেশ বদলে বদলে চলেছে; এখন দেখছি বটে পৃথিবীটা মানুষে ভরা—অর্থাৎ কোটি কোটি মানুষ রয়েছে—কিন্তু এক দিন ছিল, কয়েক লক্ষ্য বৎসর মাত্র পূর্ব্বে হয়ত—যখন মানুষ ব'লে কোন জীবের অস্তিত্ব ছিল না—ছিল বড় জোর বনমানুষ আর যত জন্তু-জানোয়ার। আরও অতীতে যদি যাই তবে দেখি জন্তুজানোয়ারের মধ্যেও হাতী-ঘোড়া সিংহব্যাঘ্র কিছু নেই, আকাশে ডানাওয়ালা জীব কিছু কিছু দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু ডাঙায় সব বিপুল অতিকায় সরীসৃপ। তারও আগে ডাঙার ভাগই মেলে কম, ডাঙার জীব অতি বিরল—ছিল সব জলজ জীব, মৎস্য কূর্ম্ম বা তাদের পূর্ব্বপুরুষ। আরও বেশী কিছু অতীতে জীবের আর সাক্ষ্য পাই না, পৃথিবীটা কেবল গাছপালা-লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। তারও আগে গাছপালা অর্থাৎ সবুজ সজীব ব'লে কিছু নেই—কেবলই চোখে পড়ে জড়পদার্থের, স্থূল-ভৌতিক বস্তুর সমারোহ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া।

এই কালের প্রবাহে স্তরের পর স্তর, শ্রেণীর পর শ্রেণীর যে একটা ক্রমিক আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে তিনটি সীমানা বা সন্ধিস্থল খুবই স্পষ্ট—এক মানুষ ও পশুর মধ্যে, দ্বিতীয় পশু বা জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে,

তৃতীয় উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে। বিবর্ত্তনতত্ত্ব প্রথম বলছে, জড়ের পরে উদ্ভিদ দেখা দিয়েছে, উদ্ভিদের পরে জীবের উদ্ভব হয়েছে, নিম্নতন জীবের বা প্রাণীর পরে মানুষ আবির্ভূত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আর বোধ হয় উঠতে পারে না—কিন্তু বিবর্ত্তনতত্ত্ব আরও বলতে চেয়েছে যে জড়ের "পরে" কেবল নয়, জড় "হ'তে"ই প্রাণ বা উদ্ভিদ জন্ম নিয়েছে, উদ্ভিদের পরে নয় উদ্ভিজ্জ-সত্তা থেকেই জীব প্রকট হয়েছে, আবার ইতর জীব বা জন্তুজানোয়ারের শুধু পরে নয় তাদেরই এক পূর্ব্বপুরুষের জঠর হ'তে প্রথম মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এই শেষ সিদ্ধান্তটিতে সকলে সব সময়ে সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়ে উঠতে পারে না—এর হেতু আছে। বিবর্ত্তনের ধারাটি সাধারণভাবে পুরোপুরি গ্রহণ করলে দাঁড়ায় এই যে জড় পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে এক সময়ে প্রাণে পরিণত হয়েছে—অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন কারবন প্রভৃতি জড় উপকরণ উপাদানের ভিতর হ'তে তখন দেখা দিল শৈবালজাতীয় আদিম উদ্ভিদ; উদ্ভিদ (অবশ্য এখনকার পূর্ণপরিণত বট-অশ্বত্থ কিছু নয়, উদ্ভিদের একটা আদিপুরুষ, তার কয়েক যুগব্যাপী ভ্রূণরূপ) পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে প্রাণীতে পরিণত হ'ল, সেই রকম আবার প্রাণী বা পশুও পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে মানুষে পরিণত হল। সুতরাং এখন প্রশ্ন, পরিবর্ত্তনের এইরকম নিরবাচ্ছন্ন ধারাবাহিকতা বাস্তবিকই দেখা যায় কি না,—মোটামুটিভাবে হয়ত দেখা যায় কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নজর দিলে দে। যায় না, বৈজ্ঞানিকেরা এই কথা বলছেন : পরিবর্ত্তনের ধারায়, স্তরে স্তরে, সত্যই ফাঁক রয়ে গেছে। প্রথম প্রথম বলা হ'ত এই যে-সব সন্ধির বা সংযোগের নিদর্শন পাওয়া যায় না, তা কালের প্রকোপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে কি। হয়ত বা যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর ভবিষ্যতে এক দিন মিলবে—এ শেষোক্ত আশা এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট ফলবতী হয় নি, আর প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য, ঠিক সন্ধিস্থলগুলিই নষ্ট হয়ে

গেল কোন বিধানের বশে? বহু অন্বেষণ বিশ্লেষণ পরীক্ষণের পর "মিসিং লিঙ্ক" এর কাছাকাছি অনেক কিছু আবিষ্কার হল বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক জিনিসটি আর পাওয়া যায় না।

সমস্যা এই, জড় ও উদ্ভিদের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ আছে কি যা সম্পূর্ণ জড়ও নয় সম্পূর্ণ উদ্ভিদও নয়, কিছু জড় কিছু উদ্ভিদ? তা ত ঠিক দেখি না। জড়ে প্রাণ যখন দেখা দিয়েছে তখন উভয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। উভয়ের মধ্যে ক্রমিক পৈঠা কিছু নাই। সেই রকম আবার উদ্ভিদও ক্রমে যখন প্রাণীর স্তরে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ম্ম যুগপৎ মিলেমিশে আছে এমন সত্তা পাওয়া যায় কি? এখানেও সেই একই উত্তর। প্রাণীব আর মানুষের মধ্যবর্ত্তী কোন জীব সম্বন্ধেও অন্য উত্তর নেই মনে হয়।

সব চেয়ে পুরানো মানুষের যে নমুনা পাওয়া গিয়েছে, আর সব চেয়ে পরে যে বন-মানুষ দেখি, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক আছে বটে —শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে; কিন্তু তবুও মানুষ মানুষ, আর বন-মানুষ বনমানুষ, পার্থক্যটা রয়ে গেছে। যে বা-নর থেকে নরের উদ্ভব হয়েছে, তার যে বুদ্ধিশক্তি নেই তা নয়, এমন কি বুদ্ধির চাতুর্য্যে মানুষকে দু-এক ক্ষেত্রে সে হারিয়েও দিতে পারে—তবুও তার নেই একটি জিনিস, তাই সে পশু আর সে জিনিস আছে ব'লেই মানুষ মানুষ (সে-জিনিসটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হ'ল আত্মসম্বিৎ—নিজেকে নিজে দেখা)। বৈজ্ঞানিকেরা তাই বাধ্য হয়ে মানুষকে মূলতঃই একটা পৃথক শ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন (homo sapiens, সজ্ঞান মানুষ) —তার নিকটস্থ যে-শ্রেণী তার নমুনা "নেয়াণ্ডারটাল" মানুষ, সে বনমানুষেরই সামিল।

এখানে আরও একটি কৌতূহলের ব্যাপার আছে। কোন বিশেষ বন-মানুষ হতে যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে, বৈজ্ঞানিকেরা তা আবিষ্কার

করতে পারেন নি। তাঁরা বলেন একই বংশের ধারায় পিতাপুত্রানুক্রমের মত একটানা সোজা রেখায় বিবর্ত্তন চলে না। নূতন একটি প্রাণীর জন্ম হল একটি নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়া ; মূল একটি শ্রেণীর বীজ হতে অনেকগুলি রূপভেদ দেখা দেয়, তাদের ভিতর থেকে একটি হয় নূতনের জন্মদাতা। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের কথা হল এই যে সময়ে সময়ে এমনও হয় যে, যে-রূপভেদটি সব চেয়ে দূরের, যার সঙ্গে সাদৃশ্য সবচেয়ে কম ঠিক তা হ'তেই নূতনের জন্ম। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষের বেলায় ঠিক এই রকম ঘটেছে। সুতরাং এখানে পশু ও মানুষের সন্ধিস্থলে ফাঁকটা খুব বড় রকমেরই রয়ে গেছে—প্রকৃতি এখানে সত্যসত্যই উল্লম্ফন দিয়েছেন।

তার পর অর্থাৎ তার আগে পশু বা জীব ও উদ্ভিদের সন্ধিস্থলটি ধরা যাক। পশুস্তরের সবচেয়ে নিম্নতন প্রাণী, জীবের প্রথম প্রকাশ হ'ল জীবাণু বা রোগবীজাণু জাতীয় সত্তা—উদ্ভিজ্জাণুর সঙ্গে পার্থক্য আছেই। এক আদি জীব যা উদ্ভিদের খুব কাছাকাছি তা হ'ল স্পঞ্জ। বহুদিন স্পঞ্জকে উদ্ভিদজাতীয় বলেই ধরা হয়েছিল ; কিন্তু আরও অভিনিবেশের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণের পর দেখা গিয়েছে যে, স্পঞ্জ প্রাণীই, উদ্ভিদ নয়, তার ডিম আছে, তার শিশুরূপ আছে (larva)—এ সব প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য।[১] স্পঞ্জেরই মত অনেকটা, মনে হয় একই জাতির বুঝি, আমাদের ব্যাঙের ছাতা (কালিদাসের "শিলীন্ধ্র") অথচ তা হ'ল উদ্ভিদ। উদ্ভিদের শেষ আর প্রাণীর অগ্র, এ উভয়ে অনেকখানি সাদৃশ্যের, ঐক্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও রয়েছে একটা বিচ্ছেদ।

আরও নীচে নেমে গেলে, নিরীক্ষণ করি যদি জড় ও প্রাণের সংযোগস্থল, তবে সেখানে এই বৈষম্য ও বৈরূপ্য বেশ পরিস্ফুট।

১ এ বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণ এখানে সম্ভব নয়। মতানৈক্যও আছে। তবে আমার প্রমাণ হলেন J. A. Thomson : Biology of Everyman.

প্রাণের প্রথম রূপ হ'ল জৈবসার (protoplasm); আর জড়, স্থূলভূত ঐ দিকে পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে শেষে যে রূপ গ্রহণ করে তা হ'ল লেহ (colloid) ও শ্বেতসার (albumenoid)। কিন্তু লেহ বা শ্বেতসার কখন কবে কি রকমে যে জৈবসারে রূপন্তরিত হয় তার ইতিহাস পাওয়া যায় না।

তাই বর্ত্তমানের সিদ্ধান্ত এই, প্রকৃতি সাধারণতঃ হেঁটে হেঁটে খুব সম্ভব চলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার লম্ফপ্রদানও করেন। ছোট-খাট উল্লম্ফন প্রায়ই ঘটেছে—তার ফলে হয় শ্রেণীর বা জাতির মধ্যে নূতন রকমের বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যের উদ্ভব। এমন কি এ ধরণের মতবাদও দেখা দিয়েছে যে প্রকৃতির গতি টানা-রেখায় আদৌ চলে না. পদে পদে উল্লম্ফন অর্থাৎ প্লুতগতিই হ'ল তার স্বাভাবিক স্বধর্ম্ম। তবে এ সকলের মধ্যে তিন (বা চারিটি) উল্লম্ফন খুব বড় রকমের হয়েছে, যার ফল কেবল জাতির পরিবর্ত্তন নয়, একটা জগতেরই রূপান্তর, তা হ'ল বিবর্ত্তনের এক পৈঠা হ'তে আর-এক পৈঠায় উত্তরণ। এই রকমে জড়ের মূল গড়ন ও গতি সম্বন্ধে আজকাল যে কণা-ব্যষ্টি-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রাণশক্তির মূল গড়ন ও গতি স্বাজাত্য অর্জন করেছে। যা হোক, বিবর্ত্তনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয় এসেছে যখন প্রাণবস্তু আবার মানসবস্তুতে পরিণত হয়েছে, তৃতীয় বিপর্য্যয় ঘটেছে মন যখন বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে—প্রথমে ধাতুপ্রস্তর, তারপর গাছপালা, তার পর জন্তু, সর্ব্বশেষে মানুষ।

এই ব্যাপারটি যে ঘটেছে তাতে বোধ হয় আর সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু সমস্যা রয়ে গেছে কি উপায়ে, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে তা ঘটেছে? বিবর্ত্তনের, অন্ততঃ জৈব বিবর্ত্তনের, হেতু বা প্রেরণা হিসাবে একটি তত্ত্ব বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হয়, তাকে নাম দেওয়া হয়েছে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। কথাটির অর্থ এই। সৃষ্টির মধ্যে

একটা লড়াই চলেছে—প্রত্যেক সত্তাকে লড়াই করতে হয় প্রত্যেক সত্তার সঙ্গে, বিশেষভাবে তার স্বজাতীয় সত্তার সঙ্গে। আর তার পারিপার্শ্বিকের—অর্থাৎ শীতগ্রীষ্ম জলবায়ু আহারবিহার প্রভৃতি সম্পর্কে —প্রয়োজন ও দাবি মিটাবার উপযোগী দেহগত ও অবস্থাগত ব্যবস্থা যে পাত্রের যত সুষ্ঠু হয়েছে এবং এ সব বিষয়ে নিজের জন্য যথাযোগ্য ও যথেষ্ট অধিকার লাভ করতে হ'লে পরের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী প্রতিযোগে যে যত প্রকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র (নখদন্তহুল ছলচাতুরী ইত্যাদি) অর্জন করেছে সে এবং তার বংশের যে সন্তান-সন্ততি এই আনুকূল্য বজায় রাখতে বা বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে তারাই জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়ে বর্ত্তে থাকে। কিন্তু বিবর্ত্তনের পদ্ধতি সম্বন্ধে এই যে সিদ্ধান্ত তা বিবর্ত্তনের সবটুকু রহস্য, তার মর্ম্মগত সত্যটি ব্যক্ত করে কি না সন্দেহ। প্রথমতঃ জীবনে সংগ্রাম আছে কিন্তু তাই ব'লে সংগ্রাম ছাড়া আর যে কিছু নাই তা বলা চলে না। সম্মিলন সাহচর্য্য জিনিসটি সমান মাত্রায় দেখা যায়। নিম্নতর জীবসৃষ্টির স্তরেও বৈজ্ঞানিকেরাই আজকাল এই সত্যটির অপরূপ অদ্ভুত উদাহরণ সব আবিষ্কার করেছেন। তার পর "যোগ্যতমে"রই উদ্বর্ত্তন হয় কেবল? সাধারণ দৃষ্টিতে কত অযোগ্যেরই উদ্বর্ত্তন হয়েছে দেখি না কি? বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের যোগ্যতা অর্থ ত শারীরিক যোগ্যতা, জীবনধারণের যোগ্যতা। বলা হয় বিবর্ত্তনের শেষ ধাপ হ'ল মানুষ। মানুষ তবে কি নিজেকে যোগ্যতম বলে প্রমাণ করতে পেরেছে, শুধু এই কারণে যে সে হ'ল আদর্শ লড়াইয়ে, যাবতীয় নখী-দন্তী-"ছলী"কে ছলেবলে-কৌশলে হারিয়ে হটিয়ে দিয়ে একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপন করেছে?

অনেক মনীষীর মত তাই এই যে, মানুষের তথাকথিত যোগ্যতা তার আত্মপ্রসাদলাভের জন্য একটা ধারণা বা কল্পনামাত্র। অনেক ইতর প্রাণীর মধ্যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য হিসাবে, অন্য

বিবর্ত্তনে যুগ-সন্ধি

প্রতিযোগীদের সঙ্গে সংগ্রামের দিক দিয়ে যতখানি যোগ্যতা আছে মানুষের ততখানি আছে কি না সন্দেহ। অনেক কীট, অনেক উদ্ভিদ—পৃথিবীতে সজীব সত্তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সুদূর অতীতে যারা দেখা দিয়েছে তারা (অর্থাৎ তাদের বংশধর)—প্রায় অপরিণত অপরিবর্ত্তিত আদিম রূপেই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তে গিয়েছে—মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তারাও তবে যোগ্যতম? ব্যাপারটি আসলে হয়ত তা নয়। বিবর্ত্তনের চিত্র থেকে বড় জোর এই কথা বলা যেতে পারে যে সৃষ্টির মধ্যে চলেছে একটা ক্রমিক উর্দ্ধায়ণ—যোগ্যতার হিসাবে নয়—তা হল নবতর উর্দ্ধতর মহত্তর তত্ত্বকে ধরে ধরে পার্থিব আয়তনের নবতর উর্দ্ধতর মহত্তর সংগঠন। এ যেন একটা সোপানাবলী বা আরোহণী—উপরে উঠে চলেছি, কিন্তু নীচের পদের উপর দাঁড়িয়ে, ভর ক'রে। নবতর উচ্চতর একটা ক্রম বা পদবী দেখা দিল, প্রতিষ্ঠিত হ'ল কিন্তু নিজের মধ্যে সে নীচের ক্রমগুলি বা পদবী গ্রহণ করল, তুলে ধরল পরিবর্ত্তিত ধরণে, তাদের বিসর্জন দিল না। জড় থেকে প্রাণ দেখা দিল—এই প্রাণতত্ত্বকে ধরে প্রাণী নামে এক নূতন সংগঠন হ'ল, কিন্তু সেখানে জড় প্রতিষ্ঠা হিসাবে আছে, জড়ের মধ্যে প্রাণ অনুস্যূত, জড় সেখানে পেয়েছে একটা নূতন ধর্ম্ম ও ক্রিয়া। সেই রকম মন (বা মনবুদ্ধি) যখন ফুটে উঠল, তার মধ্যে প্রাণ ও জড় উন্নীত হ'ল, লাভ করল আবার নূতনতর ধর্ম্ম ও ক্রিয়া—এই সমবায় গড়ল মানুষ নামক জীবকে।

বিবর্ত্তনের যথাযথ উদ্দেশ্য তবে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নয়—তা হ'ল চেতনার ক্রমবিকাশ, চেতনার উচ্চ হ'তে উচ্চতর সংগঠন। জড় হ'তে মানুষ পর্য্যন্ত যে একটি ক্রমান্বয় চলে এসেছে তার ভিতরকার সূত্র হ'ল এই চেতনা—জড়ে চেতনা সুপ্ত, প্রাণের প্রথম পদে, উদ্ভিদে, চেতনা স্বপ্নালু, প্রাণের দ্বিতীয় পদে—মনের স্পর্শ যে প্রাণ পেয়েছে সেখানে, প্রাণীর মধ্যে, চেতনা অর্দ্ধজাগ্রত, মনবুদ্ধির মানুষের চেতনা

পূর্ণ জাগ্রত। বুদ্ধি, মন, প্রাণ, জড় এই রূপচতুষ্টয়ে চেতনার চতুর্বিবধ অবস্থা—জলের যে রকম কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় (এবং শেষে বৈদ্যুতিক) অবস্থা সেই রকম।

বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তরসন্ধিতে যে একটা ফাঁক বা সংযোগের অভাব আমরা উল্লেখ করেছি তার অর্থ বা ব্যাখ্যা এবার আমরা পাব। বরফ যখন জলে পরিণত হয় তখন উভয়ের মধ্যে একটা সেতু নেই, বরফ নরম হ'তে হ'তে ক্রমে জলে রূপান্তরিত হয়েছে ব্যাপারটি এ-রকমের নয়—শক্ত যে জিনিস ছিল হঠাৎই সে তরল হয়ে পড়ল। আবার জল যখন বাষ্পে পরিণত হয় সেখানেও দেখি একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন—জল গরম হ'তে হ'তে এমন এক জায়গায় বা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে (সেটা তবুও জলীয়) যে তখন সে হঠাৎ বাষ্পীয় আকার ধারণ করে বসে, দুয়ের মধ্যে কোন উভয়পদী অবস্থা নাই। ঠিক সেই রকম জড় ও উদ্ভিদের মধ্যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে, প্রাণী ও মানুষের মধ্যে এক একটা ছেদ, ফাঁক, আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

আদিতে জড়। জড়ের অন্তরে একটা তাপন ও পাচন ক্রিয়া চলছিল, তার তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা এমন একটা বিশেষ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছল যে তার ভিতর থেকে তখন নিঃসৃত হয়ে এল প্রাণস্পন্দন। প্রাণশক্তি বা জীবনী-শক্তি জড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন লীন সুপ্ত ছিল; একটা মন্থনের ও ঊর্দ্ধায়ণের ফলে সে প্রকট হ'ল। তলা থেকে, নীচে থেকে গুপ্ত চেতনার চাপে জড়ের কোষ ফেটে, মুক্ত করে দিল প্রাণকে। চেতনা তার জড়ময় রূপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রথমে প্রাণময় রূপ গ্রহণ করলে। জড়ের মধ্যে নিভৃত চেতনার চাপে প্রাণশক্তি চারিদিকে উৎসারিত বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল শত সহস্র রূপ নিয়ে—স্থূলে তার ফল উদ্ভিদ জগৎ। উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণময় জড় সক্রিয় হয়েছে আপনাকে নব নব আকারে নব নব ধারায় সৃষ্টি করতে, গঠন করতে—পশ্চাতে অন্তঃস্থ চেতনার

চাপ প্রসারের দিকেও যেমন উপরের দিকেও তেমনি প্রযুক্ত হয়েছে; এই উৰ্দ্ধমুখী চাপের ফলে প্রাণময় জড় থেকে আবার চেতনার এক নূতন মূৰ্ত্তি দেখা দিল—প্রাণকোষ ফেটে বের হয়ে এল সংজ্ঞা, সংবেদনা—হ'ল প্রাণীর আবির্ভাব; এই সংজ্ঞা, সংবেদনা বা আদি-মনকে ঘিরে প্রাণ ও জড় লাভ করল নূতন এক গড়ন। এই আদি-মনের আবার চলতে লাগল সংমার্জন ও সংবৃদ্ধি—পিছনকার চেতনার চাপ নিরন্তর রয়েছে, সে থেমে থাকে না, থামতেও দেয় না—আদি-মন থেকে নিঃসৃত হ'ল বুদ্ধি, আত্মসম্বিৎ, তাকে ঘিরে মন প্রাণ দেহ পেল যে নব রূপায়ণ তারই নাম মানুষ।

আরও প্রশ্ন আছে, আরও রহস্য আছে। বলা হ'ল চেতনা সুপ্ত গুপ্ত লুপ্তপ্রায় হয়ে আছে সত্তার অতলে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে জেগে উঠে আসতে থাকে, তার পর আত্মোন্মীলন আত্মপ্রকাশ স্তরে স্তরে স্ফুটতর হয়ে ওঠে। প্রশ্ন, এ চেতনাটি কোথা হ'তে এল—উপরে উঠে চলবার প্রেরণা কেমন ক'রে পেল? রহস্য হ'ল এই যে, চেতনা সর্ব্বদাই একটা ঊর্দ্ধ্বের জিনিস, তার স্বরূপ রয়েছে একটা পরম পদে; এই পরম পদ, এই ঊর্দ্ধ্বতন স্তর হতে চেতনা ক্রমে নেমে এসেছে, আপনাকে ঢেকে ঢেকে চলেছে, শেষে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলেছে যেখানে তারই নাম জড়। তা হ'লে ব্যাপার এই, বিবর্ত্তন যে যে ক্রম ধরে উঠে চলেছে, ঠিক সেই সেই ক্রম ধরেই একটা নিবর্ত্তন বা অবতরণ তার আগে রয়েছে। চেতনার স্বাভাবিক অবস্থা, তার স্বরূপ হল পূর্ণতম চেতনা, যাকে বলা যেতে পারে অতি-চেতনা (কারণ, মানুষের সাধারণ চেতনা অতিক্রম করে সে রয়েছে)। এ চেতনা নিম্নাভিমুখী হয়েছে—একটা বিচিত্র বহুমুখী সৃষ্টির জন্য—ঋগ্বেদের "নীচীনাঃ স্থ্যঃ" বা গীতা ও উপনিষদের "অবাক্‌শাখং"। এই নিম্নগামী পথে চেতনা আপনাকে খণ্ডিত সংকীর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে চলেছে—অতি-

চেতনা এক সময়ে মানসতত্ত্বে পরিবর্তিত হয়েছে, তখন সৃষ্টি হয়েছে মনোময় জগৎ ; মনোময় তত্ত্ব থেকে চেতনা যখন আরও আত্মবিস্মৃত রজো-তামস হয়েছে তখন সে প্রাণতত্ত্বে পরিণত হয়েছে ও প্রাণময় জগৎ সৃষ্টি করেছে, তার পর চেতনা যেখানে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছে, পূর্ণ তামস হয়েছে সেখানে জড়ের—জড়তত্ত্বের ও জড়জগতের উদ্ভব। এই গেল চেতনার "নিবর্ত্তনে"র ক্রমসঙ্কোচনের ধারা—-তারপর বিবর্ত্তনের ক্রমবিকাশের ধারা। চেতনা এই রকমে উচচ হতে নীচে এসে পড়েছে বলেই ত আবার তাকে নীচে হ'তে উপরে উঠতে হয়েছে।

উপর হ'তে চেতনা যে নীচে নেমে এসেছে সে ধারা হ'ল প্রচ্ছন্ন, সেটি রয়েছে যেন পিছনে, অন্তরালে, এক অন্তর্লোকে—জড় বস্তু যখন প্রকাশ পেল এবং জড় জগৎ যখন বিবর্ত্তিত হয়ে চলল তখন তার লক্ষ্য ও প্রয়াস হ'ল পিছনে প্রচ্ছন্ন যে তত্ত্ব রয়েছে তাকে ক্রমে বাহিরে জাগ্রত প্রকট করা—প্রথমে জড়ের মধ্যে, জড়কে প্রতিষ্ঠা করে, তার পর সেই জড়কেই মূল বনিয়াদ করে একটির পর আর একটি তত্ত্ব বাহিরে প্রকট করে, সেই জড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত সজ্জিত করা। অন্য কথায়, নিবর্ত্তনে পৃথক্ পৃথক তত্ত্বের অবরোহ সৃষ্টি হয়েছিল ; বিবর্ত্তনের পদ্ধতি হ'ল সেই সেই তত্ত্বে—বিপরীত দিক হ'তে, পুনরায় আরোহণ ত বটেই অধিকন্তু যতটিতে আরোহণ করা যায় সবগুলিতেই যুগপৎ অধিষ্ঠিত থাকা এবং ঊর্দ্ধতমের ধর্ম্মে নিম্নতরদের নিয়ন্ত্রিত রূপান্তরিত করা।

নিবর্ত্তনের ধারায় যে-সব স্তর বা তত্ত্ব সৃষ্ট হয়েছিল বিবর্ত্তনের ধারায় তাদের ক্রিয়া এখন আমরা বুঝতে পারব। নীচের চেতনার চাপে জড় ঊর্দ্ধমুখী হয়ে উঠছে প্রাণের দিকে (অন্য কোন দিকে যে নয়) তার কারণ প্রাণ-তত্ত্ব আগে হ'তেই জড়ের উপরে রয়েছে, এবং জড়ের মধ্যে নেমে প্রকট হতে সচেষ্ট। সেই রকম প্রাণ যখন বের হয়ে নেমে এল, জড়কে অধিকার করল, তার গতি হ'ল মনের দিকে

উঠতে, কারণ প্রাণের উপরে মন আগে হ'তেই রয়েছে, সে মনও নেমে আসতে প্রকট হ'তে চায়। সুতরাং বিবর্ত্তনগত রূপান্তরের প্রণালীটি হ'ল এই যে এক দিকে নীচে থেকে চাপের, ঊর্দ্ধ্বপ্রবেগের ফলে জিনিস বদলে বদলে চলেছে আর অন্য দিকে সম্পূর্ণ রূপান্তর, একটা বিপর্য্যয় ঘটেছে তখন যখন উপর থেকে একটা তত্ত্ব নেমে সেই ঊর্দ্ধ্বায়িত বস্তুকে আশ্রয় করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, নীচের চাপে জিনিস যে বদলায় তা ঘটে ধীরে ধীরে, ধারাবাহিকভাবে কিন্তু যে মুহূর্ত্তে উপরে হ'তে কিছু নেমে আসে তখনই ধাবাবাহিকতা কেটে যায়, আসে যাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন "প্রকৃতির উল্লম্ফন"।

বিবর্ত্তনের যুগসন্ধিতে যে ফাঁক দেখা যায় তা অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক। কারণ বিবর্ত্তনের ক্রমপরিবর্ত্তনের মধ্যে রয়েছে একটা অবতরণ—এই জন্যই হয় হঠাৎ পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির যে অর্জিত রূপ-ধর্ম্ম তার অদলবদল নানা রকমে চলে তার অন্তরের প্রবেগের ফলে কিন্তু প্রকৃতি নূতন পর্য্যায়ের রূপ, নূতন পর্য্যাযের ধর্ম্ম তখনই অর্জন করে যখন তার মধ্যে অবতীর্ণ হয় ঊর্দ্ধ্বতর—নূতন রূপের ও নূতন ধর্ম্মের—একটা লোক।

অবশ্য আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় যে নীচের দিক্ হ'তে যেমন অবিরল এক চেষ্টা চলেছে ঊর্দ্ধ্বমুখী পরিবর্ত্তনের জন্য, তেমনই উপরের দিক হ'তেও প্রতিনিয়ত নেমে আসছে একটা চাপ, একটা আভাস, একটা প্রভাব। ঋগ্বেদীয় ঋষি এই গুহ্য সত্যের দিকে লক্ষ্য করেই বলেছেন বোধ হয় যে নীচ ধরে আছে উপরকে আবার উপর ধরে আছে নীচকে "অবঃ পরে পর এনাবরেণ"। তবে উপরের একটা বস্তু-তত্ত্ব যখন স্বরূপে নেমে আসে, অবতীর্ণ হয়, তখনই ঘটে বিবর্ত্তনে একটা যুগান্তর ও ক্রমান্তর।

অধ্যাত্মদ্রষ্টারা বলেছেন যে বর্ত্তমানে জগৎ, পৃথিবী আবার একটা

যুগসন্ধিতে উপস্থিত হয়েছে। মনোময় পুরুষ মানুষে পূর্ণতা লাভ করেছে, মনের শিখরে মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে, তার আগ্রহ আস্পৃহা ঊর্দ্ধ্বতর বৃহত্তর কিছুর দিকে প্রসারিত—তাই এখন সময় হয়েছে, মনের উপরে রয়েছে যে অতিমানসতত্ত্ব, তারই অবতরণ হবে এবার মানুষেরই রূপান্তরের ফলে বা অন্য উপায়ে—এবং পৃথিবীতে দেখা দেবে মানুষের অপেক্ষা পূর্ণতর এক জীব—অতিমানস বা চিন্ময় জীব।

প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৭

মায়াময় জগৎ

জগৎটি যে কতখানি মায়াময় তা প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ যোগাচারী বা সৌতান্ত্রিক হতে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক অবধি প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রাচীনকালে এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কাছে জগৎ যে মিথ্যা মরীচিকা মতিভ্রম, দার্শনিকের কথায়, বিজ্ঞান-বিজৃম্ভন মাত্র—তা আমাদের বেশ জানা ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা সেই দলে নূতন যোগ দিয়েছেন। এডিংটন বলছেন, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখছ, এই যে প্রকৃতি, সেখানে এই যে সব রূপ ও ক্রিয়া ও বিধান সবই মনের রচনা—মনের দর্পণে যে সে সমস্ত প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, মন হতেই তা উৎসারিত এবং প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। মনের বাহিরে একটা কিছু স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা ও সম্বস্তু থাকতে পারে কিন্তু তার পরিচয় পাই না, মনের মধ্যে আমরা আবদ্ধ —বৌদ্ধ শ্রমণের সাথে একসুরে আমাদের গাইতে হয়—মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেঠ্ঠা মনোময়া। এডিংটন তাই বলছেন কবি যে রকমে তাঁর কাব্য রচনা করেন, কাব্যের অস্তিত্ব যেমন কবির মস্তিষ্কে ছাড়া অন্য কোথাও নাই, ঠিক সেই রকম—অন্ততঃ অনেকখানি সেই রকম—এই বিশ্বও রয়েছে মানুষের মনে, দ্রষ্টার দৃষ্টির মধ্যে—দুইএর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নাই।

বৈজ্ঞানিক জগৎকে বলছেন অবাস্তব কল্পনাত্মক—এ কি কথা? কথা কিন্তু দাঁড়িয়েছে তাই। বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানবেত্তা অন্য জগতের খবর রাখেন না, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু তাঁর নিজের জগৎ, স্থূলভৌতিক জগৎ তাঁর চোখে এই রকমই হয়ে উঠেছে—গাণিতিক সূত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক যে রকম জোর করে স্থূল হস্তে প্রকৃতিকে চেপে ধরেছিলেন এই বলে যে

কঠিন কঠোর জড় ছাড়া এ আর কিছু নয়, তেমনি অকস্মাৎ সভয়ে তিনি দেখতে সুরু করলেন কখন কি রকমে তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সে কঠিন নীরেট পদার্থ ক্রমে গলে তরল হয়ে বাষ্প হয়ে উবে চলেছে, অশরীরী হয়ে ভাবের বস্তু হয়ে গিয়েছে; বিশ্ব তৈরী হয়েছে বিরানব্বইটি মূল জড় পরমাণু দিয়ে নয়, তৈরী হয়েছে আসলে "সম্ভাবনার ঢেউ" দিয়ে—চিন্তার আঁশ দিয়ে।

কি রকমে, একটু বুঝিয়েই বলা যাক। ব্যাপারটি দুদিক থেকে আক্রমণ করা যেতে পারে। প্রথম, যাকে বলি বাস্তব বা বিষয়, তাকে বিশ্লেষণ করে আর দ্বিতীয় হল বিষয় নয় বিষয়ীকে, জ্ঞেয় নয়, জ্ঞানের স্বরূপকে বিশ্লেষণ করে। প্রথমটি হল বিজ্ঞানের পথ, দ্বিতীয়টি দার্শনিকের পথ—তবে শেষোক্ত ধারাটি আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিককে কিছু না কিছু অবলম্বন করতে হয়েছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বৈজ্ঞানিককে অবশেষে এমন কোণঠেসা করে ধরেছে যে বাধ্য হয়ে তাঁকে দার্শনিক বনে যেতে হয়েছে। সে যা হোক, প্রথমে প্রথম ধারাটির কথা বলা যাক।

তার সুরু হল বিজ্ঞান যখন একান্তই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলল। জগৎটা কি দেখতে গিয়ে, বিজ্ঞান প্রথমে অবশ্য স্বীকারই করে নিলে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তোলারই অবকাশ ছিল না, যে জগৎ হল স্থূল নীরেট জিনিষ, আমাদের অর্থাৎ মানুষের প্রত্যয়ের বাহিরের জিনিষ, অকাট্য সত্য সে, বাস্তব সে, নিজের মধ্যে সে নিজে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল তাই নীরেট বস্তুটাকে ভেঙ্গে দেখতে ওর ভিতরে কি আছে। স্থূল মোটা রূপ বা আকার সব ভেঙ্গে প্রথমে বের হল অণু (molecule), তারপর অণুকে ভেঙ্গে ফেলা হয়, বের হল পরমাণু, পরমাণুকেও ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, পরমাণু ভেঙ্গে আবিষ্কার করা হয়েছে বৈদ্যুতিক কণা বা মাত্রা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—শেষ হলে কোন গোল ছিল না—যত বিপত্তির আরম্ভ এইখান থেকেই।

বৈদ্যুতিক মাত্রা জিনিষটা কি ? কয়েক রকমের বা শ্রেণীর মাত্রা ধরা গিয়েছে (১) যোগ মাত্রা (প্রোটন) (২) বিয়োগ মাত্রা (ইলেকট্রন) (৩) যোগ বিয়োগ মাত্রা (নিউট্রন) (৪) যৌগিক বিয়োগমাত্রা (পজিট্রন) (৫) বিয়োগধর্ম্মী যোগমাত্রাও সম্প্রতি নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে।* এই মাত্রাদের স্বরূপ কি স্বধর্ম্ম কি ? বলা হয়েছে এরা হল তরঙ্গ— একদিকে কণা হলেও কণার বৃত্তি হল ঢেউএর বৃত্তি (সোনার পাথর বাটি ?)। এই ঢেউ যে কেবল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তা নয়, একেবারেই অদৃশ্য, তাদের ক্রিয়াফল দেখে তাদের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। এতদূর তবুও না হয় বোঝা গেল, জগৎটা তবুও বাহ্য স্থূল জগৎই রয়েছে স্বীকার করা গেল (সে স্থূল যত সূক্ষ্মই হোক না) ; কিন্তু এখন আবার বলা হয়, এই যে সব তরঙ্গ এরা (অর্থাৎ প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ব্যষ্টি হিসাবে) বস্তুর বা বাস্তব তরঙ্গ নয়, তরঙ্গের সম্ভাবনা মাত্র—কি রকম ? বিজ্ঞানের বনিয়াদ, তার সর্ব্বপ্রধান ও প্রায় একমাত্র মূল-সূত্র হল পরিমাণ নির্ণয় এবং এ জন্য অবশ্য-প্রয়োজন যে আদি প্রকরণ তা হল স্থিতি নির্ণয়। জিনিষের ওজন, ও জিনিষের স্থান-কাল এই নিয়েই ত বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা। কোন জিনিষ (কতখানি ওজনের) কখন কোন স্থানে এই হিসাব ছাড়া বিজ্ঞান নাই এবং এই হিসাবের পুঙ্খানুপুঙ্খতাও একেবারে নির্ভুল যাথার্থ্য বিজ্ঞান দিতে পারে বলেই বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য। কিন্তু দেখা যায় জগৎটা যতদিন নিউটনীয় ছিল অর্থাৎ মোটা অণু বা পরমাণুরও সমষ্টিমাত্র ছিল ততদিন গোল উপস্থিত হয় নাই।

* (১) proton—যে বিদ্যুৎকণার ভার (mass) আছে আর মাত্রা (charge) আছে, আর সে মাত্রা হল যোগাত্মক (positive) ; (২) Electron—যার ভার নাই প্রায়, মাত্রা আছে, সে মাত্রা বিয়োগাত্মক (negative) ; (৩) Neutron—যার ভার আছে কেবল, কোন মাত্রা নাই ; (৪) Positron—যার ভার নাই আর মাত্রা হল যোগাত্মক ; (৫) Meson—যার ভার আছে কিন্তু মাত্রা বিয়োগাত্মক।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এসে পড়া গেল বৈদ্যুতিক মাত্রার রাজ্যে তখন সবই বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল প্রায়। কারণ এ রাজ্যে নিউটনীয় পরিমাণ হিসাব আর চলে না। এখানে বস্তুর বস্তু পরিমাণ (mass) অপরিবর্ত্তনীয় কিছু নয়—গতির সঙ্গে তা পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে—আবার গতির পরিমাণ যদি মাপা যায়, স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না, স্থান আবিষ্কার করলে গতির বেগ তার ঠিক হয় না। সবই অনিশ্চিত। শুধু তাই নয়, এ অনিশ্চয়তা কেবল মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞানপ্রসূত নয়—বস্তুর গড়নেরই মধ্যে রয়েছে এ অনিশ্চয়তা। পাশার দানের ফলে যে অনিশ্চয়তা সেই ধরণের কিছু। অনিশ্চয়তা অর্থ এটিও হতে পারে, ওটিও হতে পারে অর্থাৎ সম্ভাবনার খেলা। সুতরাং বৈজ্ঞানিক জগৎ শেষ বিশ্লেষণে হয়ে উঠল সম্ভাবনা-রেখাবলি-সমন্বিত একটা ক্ষেত্র।* আর নির্দিষ্ট একটা বস্তু হল কতকগুলি যদৃচ্ছার (chance) সমষ্টি। দৃষ্টির মধ্যে যখন বস্তু আসে তখন সে একটা স্থির স্ফুট পরিচ্ছিন্ন নিঃসন্দেহ নীরেট রূপ নিয়ে আসে—কারণ সে তখন একটা সমষ্টি, সমাহার, গড়পড়তা রূপ—তার মূল উপাদানে বিশ্লিষ্ট নয়। দৃষ্টির বাহিরে, স্বরূপতঃ, মূলতঃ তা হল অনিশ্চিত সম্ভাবনা। সুতরাং জড় জগৎটা হল বস্তুরও ঢেউ নয়—সম্ভাবনার ঢেউ মাত্র। আর বৈজ্ঞানিক এই সম্ভবনার ঢেউ সম্বন্ধে যা জানতে বা জানাতে পারেন তা হল একটা ছক বা গাণিতিক সূত্র মাত্র। পদার্থবিদ্যার সমস্যা হয়ে উঠেছে অঙ্কের সমস্যা অর্থাৎ নিছক মানসরচনার জিনিষ। জগৎ আর ভৌতিক নয়, বাস্তবিক কিছু নয়, তা হল নির্বস্তুক, তাত্ত্বিক কিছু। অবশ্য বলা যেতে পারে, পদার্থবিদ্যা যা দেয় তা হল বস্তুতে বস্তুতে সম্বন্ধের জ্ঞান,

* আইনষ্টাইনীয় দৃষ্টিতে জড় ও জড়শক্তি এক অপরূপ পরিণতি, প্রায় পরিনির্ব্বাণ লাভ করেছে—জড় ও জড়শক্তিধারা এখানে হল দিক্‌-কাল-গ্রথিত নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে বক্রতা মাত্র (a curvature in space-time continuum)।

সে সম্বন্ধ একটা সাধারণ নির্বস্তুক তাত্ত্বিক জিনিষ হবেই কিন্তু তার অর্থ নয় বস্তু নাই বা বস্তুকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ফলে ঘটেছে তাই—কারণ আমরা শুধু সম্বন্ধকেই জানি—সম্বন্ধ ছাড়া সম্বন্ধের বাহিরে বস্তু কি তা জানি না, জানবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিকের জগৎ তা হলে গণিতকারের মস্তিষ্কগত চিন্তাতরঙ্গ ছাড়া আর কি?

জিনিষটি আবার অন্যদিক দিয়ে দেখা যাক—অর্দ্ধ-বৈজ্ঞানিক ও অর্দ্ধ-দার্শনিক। বিজ্ঞান যখন সর্ব্বপ্রথম এই রূপরসস্পর্শগন্ধময় নীরেট জগতের বাহ্য ত্বকটি পার হয়ে একটু নীচে বা ভিতরে দৃষ্টি দিতে নিরীক্ষণ করতে শিখল এবং দার্শনিকও যখন বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে জগৎ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করল তখন গোড়া-তেই একটা মায়ারচনা তাদের চোখে ধরা পড়ল। পদার্থের জড়ের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তারা দেখলে যে পদার্থ বলতে আমাদের স্থূল দৃষ্টি যে গুণসমষ্টি নির্দ্দেশ করে, সে গুণরাশির সবগুলিই যে পদার্থের নিজস্ব, পদার্থের মধ্যে নিহিত তা বলা চলে না। সকলের প্রথমেই ধরা পড়ল বর্ণ-রহস্য। রঙ্ জিনিসটাকে প্রাকৃত বুদ্ধি ও সহজবোধ বস্তুরই নিজস্ব গুণ বলে দেখে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন যে বিশেষ রঙ্ হল একটা বিশেষ মাত্রার—দৈর্ঘ্যের—ঢেউ মাত্র (এক সময়ে বলা হত ঈথর বলে এক রকম সূক্ষ্ম জড়ের ঢেউ। আজকাল বলা হয় বৈদ্যুতিক-চৌম্বক ঢেউ); দ্রষ্টার চোখের পর্দ্দায় বিশেষ ঢেউ বিশেষ রঙের বোধ জন্মায়। জিনিষ থেকে উঠে আসে যা তা একটা বঙ্কিম রেখায় চালিত ধাক্কা মাত্র—তাতে রঙ বলে কিছু নাই, ওটি চোখের সৃষ্টি। সেই রকম গন্ধ, আস্বাদ, শীতোষ্ণ (বা কোমল কঠোর) এই সব গুণও পদার্থের মধ্যে নাই, তার অস্তিত্ব বিষয়ীর নাসিকায়, জিহ্বায় ও ত্বকে। প্রথমে তাই বস্তুর গুণাবলী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল—মুখ্য আর গৌণ। উপরে যে গুণগুলির কথা বলা হল

তারা গৌণ—তারা বিষয়ীর চেতনার জিনিষ। আর এক শ্রেণীর গুণ আছে—যথা, বস্তুর আকার আয়তন ওজন ভার—এসব হল মুখ্য গুণ, এগুলি বস্তুরই অঙ্গ—এগুলি হল নিত্যগুণ, অপরগুলিকে বলা যেতে পারে নৈমিত্তিকি গুণ। কিন্তু অনতিবিলম্বেই স্বীকার করতে হল এই যে পার্থক্য, এটি ভ্রান্তি মাত্র, সংস্কারের জের মাত্র। দার্শনিকেরা যে রকমে এ পার্থক্য দূর করে দিয়েছেন, তা পরে বলছি, বৈজ্ঞানিকেরাও ক্রমে আবিষ্কার করেছেন যে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে ভেদরেখা টানা যায় না। আজ আপেক্ষিকবাদ আমাদের স্পষ্টই দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে জিনিসের আকার, যাকে মনে করি জিনিষের অঙ্গীভূত স্থির নির্দ্দিষ্ট গুণ, তাও নির্ভর করে দ্রষ্টার স্থান বা দৃষ্টিকোণের উপর। একই জিনিষ তেরছা, বাঁকা, চেপ্টা, কাৎ, সোজা, ক্ষীণ, স্থূল, কত ভাবে যে দেখা যায়—অন্য সব আকারকে গৌণ বিবেচনা করে, একটা বিশেষ আকা-রকে—অর্থাৎ একটা বিশেষ স্থান হতে দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্ট আকারকেই বলি বস্তুর মুখ্য নিজস্ব আকার। কিন্তু তা কেন? সব দৃষ্টিকোণেরই ত সমান মূল্য—সত্যের দিক হতে; আমাদের কর্ম্মজীবনের জন্য হয়ত একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণই সুবিধার হতে পারে। আবার জিনিষের গতির সঙ্গে তার আকার বদলায়; একটা বিশেষ বস্তুকে যে বিশেষ আকার দেই তা তার একটা বিশেষ গতির সাথে সংযুক্ত; গতির সঙ্গে বস্তুর ভার—বস্তুপরিমাণও (mass) বদলায়—তবে কোন রূপটিকে, কোন ভারটিকে নিজস্ব গুণ বলব? সুতরাং যাকে বলা হয় মুখ্য গুণ সে সবও নির্ভর করে দ্রষ্টার বা বিষয়ীর স্থিতি, গতি, দৃষ্টিভঙ্গির উপর—তা হলে দেখা যায় এ ক্ষেত্রেও বস্তুর গুণ লেগে রয়েছে দ্রষ্টার চোখের পর্দ্দায়। চোখের পর্দ্দায় কতকগুলি তরঙ্গের ধাক্কা এসে পড়ে—এই তরঙ্গের ধর্ম্ম বা তার ধাক্কার ধর্ম্ম দিয়ে একটা বহির্জগৎ বহির্জগতের ছক আমরা সৃষ্টি করি।

বিজ্ঞান এইভাবে সব জিনিষকে জগৎকে স্পন্দনে পরিণত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন করা যায়—বৈজ্ঞানিকরাই বাধ্য হয়ে এ প্রশ্ন তুলেছেন এবং এ রকমে দার্শনিক হয়ে উঠেছেন—স্পন্দন কিসের? কোথায় ঘটে? অবশ্য মোটা রকমে বলা যেতে পারে (এবং বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়) বাতাসে স্পন্দন, আকাশে (ঈথর) স্পন্দন, আলোর স্পন্দন, বিদ্যুতের স্পন্দন—বেশ ; কিন্তু এ সব ঘটছে কোথায়, এ সবের হিসাব পরিচয় রাখছে কে? বৈজ্ঞানিকের স্নায়ুমণ্ডলী নয় কি? স্নায়ুমণ্ডলীর প্রান্তে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তারই ছক বৈজ্ঞানিক আঁকছেন—তা ছাড়া আর বেশি কিছু পারেন না—আর এই প্রতিক্রিয়া প্রতীতি, মস্তিষ্কের বৃত্তি বই ত আর কিছু নয়।

দার্শনিক তাই বলছেন এতখানি গবেষণার কোন প্রয়োজন ছিল না। বস্তুজগৎ যে মস্তিষ্কের বৃত্তি তা সহজ জ্ঞান, প্রমাণ করবার কিছু নয়। জগৎটা যে আছে বলছি, কারণ তা আমার অনুভূতির বিষয় ; কিন্তু সেই অনুভূতি ছাড়া পৃথক জগৎ কি আছে? আমার অর্থাৎ বিষয়ীর প্রত্যয় ও চিন্তার একটা সাজান-গোছানই ত জগৎ। বিষয়ীবর্জিত বা বিষয়ী-নিঃসম্পর্কিত বিষয় আছে কি না, থাকলে আসলে .ক রকম তা জানা সম্ভব নয় ; কারণ জানা অর্থই ত বিষয়ীর চিন্তার অন্তর্গত ও গ্রস্ত করা। আমাদের মগজের অনুভবাদি আমরা ঐ মগজসৃষ্ট দেশ ও কালের মধ্যে ফেলে আমাদের বাহিরে যেন নিক্ষেপ করি, আমাদের হতে পৃথক স্বাধীন অস্তিত্ব তাদের আছে বোধ করি, কিন্তু এটি মায়ারচনা—বার্কলে হতে এডিংটন বা মর্গান অবধি একে বলছেন objectivisation, বৌদ্ধেরা এরই নাম দিয়েছে প্রতীত্যসমুৎপাদ।*

* "নাম ও রূপ উভয়ই পরমার্থতঃ অস্তিবিহীন ; উহাদের অন্তরালে অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞেয় কিছুই নাই ; উহা কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরামাত্র ; উহারা ঐরূপ

বৈজ্ঞানিকে দার্শনিকে মিলে এইভাবে জগৎকে মায়াময়, ভ্রান্তিময় বলে ঘোষণা করছেন। স্বপ্রতিষ্ঠ স্বরূপস্থ জগৎকে জানা যায় না—সে রকম কিছু আছে কি না তাও জ্ঞান-বহির্ভূত জিনিষ। ঊর্ণনাভের মত আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর হতে রচিত জালের মধ্যে—চিন্তা-জালের মধ্যে ঘুরে ফিরে চলছি।

এ সিদ্ধান্ত দারুণ যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হয় বটে, মনে হয় বিচার বিতর্কের পথে যদি চলি তবে অন্য সিদ্ধান্তের কোন অবকাশ আর নাই। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে মানুষ কখন তুষ্ট নয়—এর মধ্যে ফাঁক কোথাও রয়েছে মানুষে অনুভব করে, কিন্তু সকল সময়ে বুঝাতে পারে না। অবশ্য কাণ্ডজ্ঞানীদের (commonsense school) পথ আলাদা—টেবিলে ঘুষি মেরে তারা প্রমাণ করে দেয় জগৎ আছে, জড় পদার্থ আছে—কঠোর কঠিন নীরেট বাস্তব হিসাব! তাঁরা বলছেন অতি জ্ঞানের দরকার নাই, কাণ্ডজ্ঞান রাখ। জগৎটা যেমন দেখছ, সেইভাবেই সে আছে—তেমনি রূপরঙ নিয়ে। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরাও মোটামুটি আজ ঐ ধরণের কথাই বলছেন, ওরকম স্থূল ভাষায় হয়ত নয় কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তই একটু সূক্ষ্মভঙ্গীতে। এডিংটন বলছেন জগৎটা যে বাহিরে বাস্তবিকই আছে আমরা যে রূপে দেখি প্রায় সেই রূপেই এটা হল বিশ্বাসের কথা—an act of faith—বিশ্বাস ছাড়া (অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রের মত) এ ক্ষেত্রেও উপায়ান্তর নাই। আর কেউ কেউ (যথা, নববস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায় (Neo-Realist) আবার এই প্রসঙ্গে natural piety-র সঙ্গে সব গ্রহণ করার কথা বলছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এই সমস্যা ও বিপত্তির মধ্যে এসে পড়েছেন—তিনি বলছেন জগৎটাকে, বাহ্যবস্তুকে স্বীকার করে নিতে হয় স্বীকার্য্য হিসাবে—working hypothesis.

দেখায় মাত্র; কিন্তু উহাদের প্রকৃত স্বরূপ স্বপ্নের মত; এইটুকু বলাই প্রতীত্যসমুৎপাদের তাৎপর্য্য।"—প্রতীত্যসমুৎপাদ, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ("জিজ্ঞাসা")

হিসাবে; বস্তুজগৎটাকে স্বীকার করে নিলে বস্তুজগতের সব ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হয়, অন্যান্য সমস্যারও একটা সুরাহা হয়—তাই বস্তুজগৎ সত্য।

কিন্তু এ সব রকম ফন্দীতে জগতের উপর মায়ার bar sinister: কলঙ্কচিহ্ন, রয়েই গেল। সত্যকার উদ্ধারের পথ নাই? দার্শনিকদের মধ্যে কান্টও একটা পথ বাতলে দিয়েছেন—বিচারের পথ ঐ রকম গোলমেলে বটে, কিন্তু মানুষের আরও অন্যদিক আছে, যে দিক দিয়ে জগতের বা বিচারাতীত জিনিষের অস্তিত্ব বা বাস্তবতা গ্রাহ্য। কথাটা সহজ কিন্তু গভীর, সমস্যাপূরণের পথ ঐ দিক দিয়ে—তা বলছি। জগৎ যে আছে, আমাদের বাহিরেই আছে আর জগতের যে রূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তা যে জগতেরই, তা যে সত্য ও বাস্তব, কেবল মন-গড়া নয়, এ কেবল বিশ্বাসের, স্বীকার্য্যের বা অনুমানেরও কথা নয়। দার্শনিকের তথা বৈজ্ঞানিকের ভুল এইখানে যে জগতের সাথে পরিচয় বা সম্বন্ধের মাত্র একটি পথ আছে ধরে নিয়েছেন—মনের বুদ্ধির বিচারের পথ। কিন্তু তা নয়—কান্ট অন্তত অন্য একটি রাস্তার কথা বলেছেন; সম্বোধিবাদীরাও (Intuitionist) যুক্তিবাদীদের "নান্যঃ পন্থা" মন্ত্র স্বীকার করেন না।

আসল কথা হল এই। সত্য যে সত্য, বস্তু যে বাস্তব তার একমাত্র প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকার। তবে এই সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন পর্য্যায় বা স্তর আছে, বস্তুর বা বাস্তবের স্তর হিসাবে। স্থূল ইন্দ্রিয় জগৎকে যে দেখে ও যে ভাবে দেখে তা একটা প্রত্যক্ষবোধ, সাক্ষাৎকার, একাত্মানুভব। ইন্দ্রিয় স্থূল বস্তুকে অনুমান করে নেয় না, তাকে স্পর্শ করে, তার সাথে একীভূত হয়ে, তার সত্যতার পরিচয় ও প্রমাণ পায়। দেশ আছে, কাল আছে, বস্তু আছে, বাহ্য সত্য হিসাবেই তারা মনের চিন্তার রচনামাত্র নয়—এ সকল বিষয়ের সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের হল অপরোক্ষ-জ্ঞান ও উপলব্ধি। তাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠি তখন

যখন তার সমপর্য্যায়ের করণ দিয়ে নয়, ভিন্ন পর্য্যায়ের করণ দিয়ে—মনের বিচার যুক্তির সহায়ে—তাদের পরিচয় লাভ করতে চাই ; তখন তারা স্বভাবতই গৌণ প্রত্যয়ের জিনিষ, অনুমানের জিনিস হয়ে পড়ে। মন সাক্ষাৎভাবে দেখে, প্রত্যক্ষ করে, একাত্মতার ফলে সত্যবস্তু বলে জানে মনের জিনিসকে, মনের বিবিধ বৃত্তিকে। মন বুদ্ধি তার নিম্নতর জিনিসের সম্বন্ধে যেমন সাক্ষাৎপরিচয় পায় না তেমনি তার উর্দ্ধতর জিনিস সম্বন্ধেও—যথা, আত্মা, ভগবান প্রভৃতি—সাক্ষাৎ পরিচয় পায় না। সেই রকমে প্রাণও তার নিজের স্তরের সত্যকে দেখে—সাক্ষাৎ-ভাবে, অপরোক্ষভাবে, তার সাথে একীভূত একাত্ম হয়ে। বের্গসঁ-এর সমস্ত দর্শনই হল এই প্রাণস্তরের সাক্ষাৎ দর্শনের কথা এবং তাঁর ইনটুইশন (Intuition) এই প্রাণময় একাত্মতা ; এই জন্যই জড়ের পৃথক অস্তিত্ব তিনি দেখতে পারেন নাই এবং তাঁর ভগবান বা উচ্চতর অধ্যাত্ম সত্যগুলি এই প্রাণময় অনুভূতিরই বিভিন্ন রূপায়ণ মাত্র। প্রাণের নিরবচ্ছিন্ন গতি যেখানে ব্যাহত হয়েছে, থেমে গিয়েছে (অন্তত বুদ্ধি তাই বোধ করে) সেখানেই তখন দেখা দেয় যাকে বলি জড়—আধ্যাত্মিক মুক্তি বা স্বাধীনতা হল প্রাণের এই নিরবচ্ছিন্ন গতির সাথে এক হয়ে যাওয়া।

স্থূল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে বস্তু জগৎ, প্রাণপুরুষ প্রত্যক্ষ করে প্রাণ জগৎ, মনঃপুরুষ প্রত্যক্ষ করে মনোজগৎ—আর আত্মা সাক্ষাৎ করে আধ্যাত্মিক জগৎ। প্রত্যেক জগৎই সত্য, সকলেই সত্য—তবে কথা এই, প্রত্যেকে সত্য তখন যখন প্রত্যেকে আপন ক্ষেত্রেরই মধ্যে আবদ্ধ অর্থাৎ সংযত থাকে, অন্য ক্ষেত্রের মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করে না। ফলতঃ একটি স্তরের দৃষ্টি দিয়ে আর একটি স্তরকে দেখতে গেলেই যা ছিল প্রত্যক্ষ তা হয়ে পড়ে পরোক্ষ—ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি দিয়ে যদি মনকে দেখতে যাই (Behaviourist নামক মনস্তাত্ত্বি-

কেরা যা করেন) তবে মনের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্য লোপ পায়, সেই রকম মনের দৃষ্টি দিয়ে যদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দেখি (rationalist-রা যা করেন) তা হলে ইন্দ্রিয় হয়ে পড়ে একটা গৌণ অবাস্তব প্রকরণ। আরো বলা যেতে পারে একটি স্তরের প্রত্যক্ষকে আর একটি স্তরের প্রত্যক্ষ দিয়ে বাতিল বা অস্বীকার নয় তবে সংশোধন করে, সংশোধন হয় ত ঠিক নয়, সীমানাবদ্ধ করে বা যথাসন্নিবিষ্ট করে ধরা যায়—আর সাধারণতঃ তা করা যায় নীচেরটিকে উর্দ্ধ্বতরটি দিয়ে। ক্ষুদ্র সীমানার অন্তর্গত সাক্ষাৎলব্ধ সত্যকে সার্ব্বভৌম সত্য বলে ধরাই হল ভ্রান্তি ও প্রমাদ—আধুনিক আপেক্ষিক-তত্ত্বও এই কথাই বলছে; কিন্তু তাই বলে যে সত্য আপেক্ষিক অর্থাৎ স্থানকালপরিচ্ছিন্ন তা যে অসত্য তা নয়। মায়াবাদী (বৈজ্ঞানিক মায়াবাদী হৌন বা দার্শনিক মায়াবাদী হৌন বা আধ্যাত্মিক মায়াবাদী হৌন) যে ভুল করেন তা ঠিক এইখানে। খণ্ড সত্য আছে, খণ্ড বাস্তব আছে, পূর্ণ অখণ্ড সত্য হল তা'ই যার মধ্যে সে-সকলের সমন্বয় সামঞ্জস্য হয়েছে, এমন নয় যেখানে একটিমাত্র সত্য আছে আর অন্য সব কিছু বিলোপ হয়ে গিয়েছে।

আমরা বলেছি নীচের সাক্ষাৎকারকে তার উপরের সাক্ষাৎকার দিয়ে সংশোধিত বা পরিচ্ছিন্ন করে নিতে হয়—কিন্তু এ কাজটি সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয় প্রাণ-মন-বুদ্ধি এরা সকলেই মোটের উপর একান্তই সীমাবদ্ধ অজ্ঞানের বা অর্দ্ধজ্ঞানের রাজ্যে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই রকম একটা সংশোধন ও সংস্কারের প্রক্রিয়া আছে বটে। বৈজ্ঞানিক প্রথমে ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে আশ্রয় করে, তার সত্যতায় নির্ভর করে তাঁর যাত্রা সুরু করেন—কিন্তু এর সঙ্কীর্ণতা সংশোধন করে নিতে চেয়েছেন মনের—বিচার-বিতর্কের যুক্তির সহায়ে; কিন্তু এ কাজটি সহজ নয়, কতখানি বিপদজনক তা আমরা দেখেছি—ইন্দ্রিয়প্রত্যয়কে সংশোধন করতে গিয়ে সংহার করেছেন। প্রথমে

ইন্দ্রিয়কে অতিমাত্র করে ধরেছেন, শেষে মনের বিচার বিতর্ককে অতি-মাত্র করে ধরেছেন। উভয়ের সামঞ্জস্য বা সংযোগ খুঁজে বার করতে পারেন নাই।

এই সামঞ্জস্য ও সংযোগ রয়েছে আরও উর্দ্ধ্বতর এক চেতনার ক্ষেত্রে এক আধ্যাত্ম সাক্ষাৎকারই পূর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে তুলে ধরে। তবে এ রাজ্যেও একটা আশঙ্কা আছে—একটা চোরাগলি (cul-de-sac) আছে। ইতিপূর্ব্বে তাকে আমি মায়াবাদীর আধ্যাত্মিকতা নাম দিয়েছি। কারণ এটি হল বিশুদ্ধ নিষ্কল সমাধিগত আধ্যাত্মিক চৈতন্যের কথা—এর মধ্যে জ্ঞানের অনুভূতির প্রত্যয়ের আর কোন অঙ্গ থাকে না। অপরার্দ্ধগত দেহ-প্রাণ-মনের অনুভূতির মতনই এর অনুভূতি একদেশ-দর্শী।

এই রকমের এক অখণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ সাক্ষাৎকার আছে—যেখানে ইন্দ্রিয় দেখে সাক্ষাৎভাবে, প্রাণ দেখে সাক্ষাৎভাবে এবং মনও দেখে সাক্ষাৎভাবে যুগপৎ; কারণ এরা সকলে একটা গভীরতর উর্দ্ধ্বতর বৃহত্তর চেতনার অঙ্গীভূত তখন। এ চেতনা একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বটে, কিন্তু মায়াবাদীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নয়, একে ছাড়িয়ে সে গিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ এই তত্ত্বের বা ভূমির নাম দিয়েছেন অতিমানস বা চিন্ময় বিজ্ঞান। এ দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টি বাস্তব হয়ে উঠেছে। দেহ প্রাণ মন আত্মা তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত এবং একটা পূর্ণ ও সমগ্র সমন্বয়ে বিধৃত।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪৯

চেতনার ক্রমগতি

সৃষ্টির রহস্য—তার অর্থ ও উদ্দেশ্য—বুঝতে হলে বোঝা ও মানা দরকার অভিব্যক্তির তত্ত্বটি। অর্থাৎ সৃষ্টি যে চলেছে ক্রমবিকশিত হয়ে, স্তরে স্তরে সে যে আপনাকে অধিকতর প্রকট ও উন্নীত করে ধরছে, এই সত্যটি সৃষ্টির মর্ম্মকথা।

সৃষ্টির যে ক্রমবিকাশ তার বাহ্য অঙ্গ নিয়ে, সে ধারাকে বলা হয় বিবর্ত্তন ; পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এ তথ্যটি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন। জগৎটা প্রথমে আদিতে ছিল শুষ্ক জড়াণুর সমষ্টি, তারপর জলের আবির্ভাব, জলের মধ্যে প্রাণের জন্ম, তারপর প্রাণময় উদ্ভিদ, তারপর প্রাণী,—প্রথমে ইতর প্রাণী, পরে উচ্চতর প্রাণী ; উচ্চতর প্রাণীর শেষ পৈঠায় বানর বনমানুষ, সকলের শেষে এসেছে মানুষ। প্রথমে আবার আদিম অসভ্য মানুষ, ক্রমে মার্জিত সংস্কৃত সভ্যমানুষের উদ্ভব। এই যে ক্রমোদ্ভব ও ক্রমোন্নতির চিত্র মোটের উপর এটি সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

তবে এ হল মুখ্যতঃ বাহ্যরূপ বা আকৃতি পরিবর্ত্তনের কথা ; কিন্তু এর অন্তরালে রয়েছে একটা স্বভাব বা প্রকৃতিপরিবর্ত্তন ; পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এদিকে তেমন দৃষ্টি দেয় নাই। আমাদের ঐতিহ্যে এই আন্তর অভিব্যক্তির কথা আছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যেরা স্থূল অভিব্যক্তিতত্ত্বকে যে রকম বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রমাণাদিসহ সাজিয়ে গুছিয়ে ধরেছেন আমরা সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির কথা সে-রকম কিছু করি নাই।

এদিকটা যে পরিণত পুষ্ট হয় নাই তার কারণ এই যে একটা সময় এসেছিল ভারতের ইতিহাসে যখন আমরা জোর দিতে সুরু করেছি

সৃষ্টির উপর নয়, সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টির বাহিরে আর একটা কিছুর উপর। সৃষ্টির নিজস্ব মূল্য বা কোন মূল্যই যে আছে ক্রমে অতি সত্বরে আমরা ভুলে গিয়েছি বা অস্বীকার করেছি।

সে যা হোক, যে সূক্ষ্ম বা আন্তর অভিব্যক্তির কথা আমরা বলছি, যার প্রতিরূপ বা বাহ্যছায়া হল স্থূলভৌতিক অভিব্যক্তি, তার মূল তত্ত্বটি হল এই যে অভিব্যক্তি অর্থ চেতনার অভিব্যক্তি। চেতনারই ক্রমবিকাশ ক্রম-উর্দ্ধায়ণ ক্রমরূপান্তর ঘটছে। সৃষ্টির গোড়া বা প্রতিষ্ঠা হল জড় —অন্ন-ব্রহ্ম, ব্রহ্মের যে রূপ ইন্দ্র-বিরোচন তাঁদের সাধনায় সর্ব্বপ্রথমেই সাক্ষাৎ করেছিলেন—জড়, অর্থাৎ চেতনার সম্পূর্ণ অভাব বা অচেতনা। এই অচেতনা কি রকমে সচেতন হয়ে উঠল, তাই সৃষ্টির গোপন ইতিহাস। চেতনার তিনটি অবস্থার কথা উপনিষদে বলছেন—সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত। আমরা বলতে পারি—অবশ্য উপনিষদে কথাগুলি যে এই অর্থে ব্যবহার করেছে তা নয়—চেতনার সুষুপ্তি দিয়ে সৃষ্টির আরম্ভ. চেতনা যেখানে সম্পূর্ণ নিদ্রিত তারই নাম জড় ; গাঢ়ত্ব যখন তরল হয়ে এসেছে, গতি যখন নিদ্রাভঙ্গের দিকে, তখন হল স্বপ্নাবস্থা—নিদ্রাজাগরণের মধ্যবর্ত্তী বা মিশ্রিত অবস্থাই স্বপ্ন ; বিশ্বচেতনার এই স্বপ্নাবস্থা—বিষ্ণুর এই দ্বিতীয় পাদক্রম—আশ্রয় করে যে সৃষ্টি তা রূপ পেয়েছে উদ্ভিদজগতে। তারপর নিদ্রা হতে পূর্ণ মুক্তির অবস্থা, যাকে বলা হয় জাগ্রত, চেতনার সেই তৃতীয় ক্রমে প্রাণীর আবির্ভাব। জড় একান্ত স্থাণু ; উদ্ভিদ স্থিতিকে আশ্রয় করে গতিশীল, তবে তার গতি কেবল একদিকে ; প্রাণীর হল মুক্ত বহুধা গতি, সম্পূর্ণ সচল সে।

চেতনা জাগ্রতে এসেও কিন্তু থেমে যায় নাই। জাগ্রতের প্রথম অবস্থায় চেতনা বহির্ম্মুখী—পরাঞ্চিখানি—পশুর চেতনা এই পর্য্যায়ের। জাগ্রত চেতনা যখন অন্তর্ম্মুখী হতে পেরেছে, তখনই মানুষের জন্ম। মানুষের চেতনা নিজেকে নিজে ফিরে দেখতে পারে, মানুষের আছে

আত্মসংবিৎ। জাগ্রত চেতনার এই বৈশিষ্ট্যই মানুষের মানুষত্ব। চেতনার জাগ্রত চেতনার পরিণতি এখানে এসেও শেষ হয় নাই—অন্তর্মুখী* কেবল নয়, এখন তাকে হতে হবে ঊর্দ্ধমুখী। চেতনা যখন ঊর্দ্ধমুখী হয়, ঊর্দ্ধে উঠে দাঁড়ায়—হয় পরাচীন—তখন সে লাভ করে তার চতুর্থ পদবী—তুরীয় অবস্থা—তার আধ্যাত্মিক স্থিতি, তার স্বরূপে অবস্থান।

জড়, জড়াবিষ্ট চেতনা এই রকমে ক্রমে অধিক হতে অধিকতর জাগ্রত ও চিন্ময় হয়ে উঠছে—সত্যিই উঠছে, ঊর্দ্ধে উঠে চলেছে—তার শেষ পরিণতি পরিসমাপ্তি হল সম্পূর্ণ চিন্ময় ও জাগ্রত হয়ে ওঠা। জড় জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ হয়ে উঠবে পরাচেতনার, এই পৃথিবীই হয়ে উঠবে স্বর্লোক।

চেতনার বিবর্ত্তনে চেতনার ঊর্দ্ধায়ণ রয়েছে বটে কিন্তু তার অর্থ কোন কোন সাধনায় যাকে বলে বিলোমগতি তা নয়, অর্থাৎ ঊর্দ্ধায়ণের ফলে নিম্নতরটি যে ঊর্দ্ধতরের মধ্যে উঠে লোপ পেয়ে যায় তা নয়—পায় একটা রূপান্তর। ফলতঃ বিবর্ত্তন বা অভিব্যক্তির মধ্যে যেমন রয়েছে ঊর্দ্ধায়ণ—নীচের ঊর্দ্ধগতি—তেমনি আবার আছে অবতরণ—ঊর্দ্ধের নিম্নাগমন; প্রথম ধারায় নিম্নতন পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, দ্বিতীয় ধারায় ঊর্দ্ধতন মূর্ত্তিমান হয়ে ওঠে, পার্থিব সত্য হয়ে দেখা দেয়। ক্রমপরিণামের ধারা ও লক্ষ্য এমন নয় যে অচেতন চেতন হয়ে ঊর্দ্ধায়িত হয়ে—সূক্ষ্মতর হয়ে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যায় লোকাতীতের—বিশ্বাতীতের মধ্যে, সৃষ্টির বাহিরে যে সচ্চিদানন্দময় স্থিতি বা মহাশূন্য তার মধ্যে। বিবর্ত্তনের সমস্ত অর্থ ও উদ্দেশ্য হল জড়ের মধ্যে জড়কে আশ্রয় করে সূক্ষ্মতমকে গূঢ়তমকে ঊর্দ্ধতমকে সচ্চিদানন্দকে পরাৎ-

* অবশ্য এই অন্তরেরও অন্তর আছে—যাকে বলা হয় অন্তর্হৃদয়। এই অন্তরতম ঊর্দ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযুক্ত। এই অন্তরতরের রাস্তা দিয়ে সহজে নিম্ন হতে ঊর্দ্ধে ওঠা যায়, ঊর্দ্ধও সহজে নেমে আসে নীচে।

পরকে—যে নামই দেওয়া হোক না—পরম সৎ-বস্তুকে—ক্রমে জাগ্রত জীবন্ত লীলায়িত করে ধরা।

জড়ের এই যে রূপান্তর—প্রাচীন রসবিদ্যা (আলঙ্কারিক নয়, রাসায়নিক) বোধ হয় তার প্রতীকাবলীর ভিতর দিয়ে এই জিনিষটি লক্ষ্য করেছিল—তা ঘটায় কোন শক্তি ? প্রকৃতির নিজের শক্তি এজন্য যথেষ্ট নয়। মানুষের মধ্যে মানুষী বুদ্ধি বা শক্তি যে এ কাজ করতে পারে বা পারবে তার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতির দিক থেকে যা পাওয়া যায় তা হল একটা আকাঙ্ক্ষা আস্পৃহা অভীপ্সা আবাহন—তা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, আবহাওয়া তৈরী করে, সব আয়োজনই করে হয়ত ; কিন্তু জিনিষটি ঘটায় প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির অধীশ্বর, ভগবান স্বয়ং। ভগবান জড় দেহ ধারণ করে আসেন এবং আপন দেহের চাপেই যেন জড়কে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করতে থাকেন। অবতারের এই নিগূঢ় অর্থ ও ইতিহাস।

প্রকৃতির বিবর্ত্তন চলেছে, ভগবানের অবতারেরও বিবর্ত্তন সেই সঙ্গে চলেছে। যুগসন্ধির প্রয়োজন অনুসারে অবতারের রূপবৈশিষ্ট্য ও রূপবিকাশ। অবতার আসেন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন-জন্য—এ হল বাহ্য কথা ; আসল রহস্য প্রহলাদের কথায় কতকটা বলা যেতে পারে—ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং। ভগবান মহাপুরুষ হয়ে তনুগ্রহণ করেন যুগক্রমগত ধর্ম্মকে—সক্রিয় তত্ত্বকে—প্রকট করবার জন্যে, প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, পালন করবার জন্যে। আমাদের দশাবতারের যে চিত্র আছে তার বিবর্ত্তনক্রমটির উপর অনেকেই ইতঃ-পূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। মতানৈক্য থাকলেও মোটের উপর স্বীকৃত এই হলেন দশাবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ এবং কল্কি।

জড় হতে জীবনের যখন প্রথম আবির্ভাব, তা ঘটে শুষ্কজড়রেণু

যখন জলে পরিণত হয়েছে, জলেই জন্মে প্রথম জীব, তাই আদি জলীয় জীবের প্রতীক প্রতিভূ ও অধিষ্ঠাতৃ হলেন মৎস্য। তারপর জল হতে যখন পলি পড়ে মাটি হতে সুরু করল, পথিবী-গঠনের আরম্ভে জীব হল উভচর, তাই সে-যুগের যুগধর্ম্মের বিগ্রহরূপে এলেন কূর্ম্ম। তারপর মাটি যখন তৈরী হয়ে গিয়েছে, শক্তমাটির উপর জীব যখন চলাফেরা করতে সুরু করেছে, তখন জীব ক্রমপরিণতির আর এক ধাপ উপরে উঠেছে, সে যুগের প্রতিভূ, যুগেশ্বর হলেন বরাহ। এ পর্য্যন্ত গেল পশুর যুগ, মানষ এখন আসবে, মধ্যবর্ত্তী যুগে পশু ও মানুষের সংমিশ্র — পশুর মধ্যে মানুষ দেখা দিয়েছে কি মানুষের মধ্যে পশুর ভাগ প্রবল— তার নিদর্শন ও প্রতীক নৃসিংহ। পরে এল সত্যসত্যই মানুষ কিন্তু মানুষের শৈশব অপরিণত অবস্থা, ভগবান তাই বামন অবতার। তারপর পরিণত পূর্ণপ্রাংশুতার মানুষ। এযাবৎ ক্রমান্তর যে ঘটেছে তাতে বাহ্যরূপের পরিবর্ত্তন অতিস্পষ্ট ; প্রথমে দরকার দেহের, আধারের গঠন—গোড়ার দিকে প্রকৃতির সমস্ত চেষ্টা নিযুক্ত থাকে এই আশ্রয়কে যথাযথ পরিমাণে পরিমাপে তৈরী করবার জন্যে, যাতে সে ধারণ করতে পারে ভবিষ্য প্রকাশ। বাহ্যরূপটিই হবে আন্তর ভাবের ও অর্থের প্রতীক ও পরিচয়। কিন্তু পূর্ণমানুষে এসে ক্রমান্তর ও রূপান্তর অন্তর্মুখী হয়েছে। বাহ্যরূপ পেয়েছে তার পাকা কাঠামো ; এখন প্রয়োজন অন্তরের পরিবর্ত্তন ও পরাবর্ত্তন। পরশুরামের আবির্ভাব হল তখন যখন মানুষ তার স্বকীয় আকার ও আকৃতি পেয়েছে বটে, তার পাশবিকতার পাশ কেটে মাথা তুলেছে বটে কিন্তু তার প্রকৃতি ত নও তীব্র রুক্ষ রাজসিক, ক্ষাত্র-বিক্রম এই সুনামে যদিও তার পরিচয়। পূর্ণ রুদ্র ক্ষাত্র তেজ নিয়ে তাই ভগবানের অবতরণ—সকল ক্ষাত্রবীর্য নিজের মধ্যে আকর্ষ করে ক্ষয়ের জন্য তৈরী করবার জন্য। শ্রীরামে মানুষের সাত্ত্বিক চেতনা প্রকট ও মূর্ত্তিমান। তাই শ্রীরামের নিকট

পরশুরাম হতবীর্য্য।* কিন্তু কেবল রাজসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা নয়, শ্রীরামের আসল কাজ ছিল প্রাকৃত রাজস-তামসিক শক্তির উপর বিজয়। রাবণ-কম্ভকর্ণকে নিহত করে শ্রীরাম মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিক চেতনার অবতর করালেন—প্রতি । করালেন। পরের ক্রম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণে মূর্ত্ত এক ত্রিগুণাতীত, যাকে বলা যেতে পারে অধি-মানস চেতনা। এই চেতনাকে তিনি মর্ত্ত্যলোকের পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে এসেছেন, মানষের নিভৃত চেতনাকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন, সেই চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়া মানষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। দশাবতারের মধ্যে শ্রীকষ্ণের পরে স্থান দেওয়া হয়েছে বুদ্ধকে। অবতারক্রমানুয়ে বুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে এই জন্যে কারুণ্যমাতন্বতে —অর্থাৎ যে জন্যে তিনি অবলোকিতেশ্বর। অধ্যাত্মসম্পদ কেবল নিজের বা অল্পসংখ্যক অধিকারীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়—সমস্ত বিশ্বই হবে এই পরমধনের অধিকারী, মানবজাতির সহজধর্ম্ম হবে আধ্যাত্মিকতা। জগৎ দঃখ দিয়ে গঠিত? পরমকারুণিকের সাধনা—সকল জীব সকল দুঃখ হতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হবে—সর্ব্বসত্ত্বাঃ সর্ব্বদুঃখেভ্যঃ পরিমোক্ষিতাঃ। অবলোকিতেশ্বর হল এই মাটির পৃথিবীর উপর ভগবানের আশার্ব্বাদ, মর্ত্ত্যজীবমাত্রেরই উপর ভগবৎপ্রসাদবর্ষণ। অবশ্য সাধারণতঃ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সব মানুষ মুক্তি পাবে অর্থ একে একে তারা পৃথিবী ছেড়ে মর্ত্ত্যজীবন পার হয়ে জীবনের অতীত এক অবস্থায় লাভ

* অবতারে অবতারে বিরোধ বিসদৃশ বোধ হতে পারে সাধারণ দৃষ্টিতে। কিন্তু বিভিন্ন তত্ত্ব যদি মূর্ত্তিমান হয়ে থাকে বিভিন্ন অবতারে তবে বৈসাদৃশ্য এমন কি সংঘাত স্বাভাবিক। তাছাড়া এখানে এমনও হতে পারে দুটি পরস্পর দূরবর্ত্তী যুগের দুটি ঘটনা মানুষের স্মৃতির মধ্যে উপর্য্যুপরি ন্যস্ত হয়ে একটা অখণ্ড কাহিনী রচনা করেছে। ইতিহাসকে আমরা ব্যাখ্যা করছি বাস্তব ঘটনা দিয়ে ততখানি নয়, যতখানি প্রতীকের রূপকে আশ্রয় গ্রহণ করে।

করবে পরমসুখ। কিন্তু প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করে আমরা অন্যরকম পরিণাম আশা করি। আমরা বলি ইহৈব তৈর্জিতং— এই ইহকালে এই মরলোকেই এই জয় হবে। এবং এই পরম জয় এনে দেবে প্রতিষ্ঠা করবে এসে শেষ অবতার কল্কি। অধ্যাত্মদ্রষ্টারা দুঃখ-বিড়ম্বিত মোহলাঞ্ছিত মানুষকে এই পরম আশ্বাস দিয়েছেন।

উদ্বোধন, কার্ত্তিক, ১৩৪৯

দ্বিতীয় পর্ব্ব

বৈজ্ঞানিক ভেল্কি

পরশ-পাথরের কথা আছে—যা দিয়েই তাকে ছোঁয়া যায়, তাই সোণা হয়ে যায়। মানুষ অনেক কাল ধ'রে এই পরশ পাথর খুঁজে বের করবার চেষ্টায় ফিরেছে। আমাদের দেশে সাধু সন্ন্যাসীরা এই রহস্যটা জানেন, এ বিশ্বাস জন-সাধারণের মধ্যে খুবই আছে। এমনও শুনেছি যে অনেকে নাকি এক মুঠো ধুলো ভেল্কী-বাজের হাতে সোণা হয়ে যেতে স্বচক্ষে দেখেছেন। আজ কালকার অর্থকষ্টের দিনে এই বিদ্যেটা আয়ত্ত করতে পারলে বড়ই সুবিধা হ'ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিই বা এ বিদ্যা কোথাও কারো জানা থাকে, তাঁদের জানা নেই এই শিশুবোধের তথ্যটা যে, বিদ্যা "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"।

তবে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এ বিদ্যাটা মেরে নেবার জন্যে যে, কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। ইউরোপ ভেল্কী মানে না, লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করে না। সে যা করে তা বেশ খোলসা করেই করে। তাই আশা হয় (আশঙ্কাও যে কিছু হয় না তা নয়) যে, শীঘ্রই মানুষের অর্থকষ্ট আর থাকবে না, লোহাকে সোণা করা অথবা সোণাকে লোহা করা মানুষের হবে সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান আজ দেখাচেছ যে, ধাতুতে ধাতুতে আর সে পার্থক্য নাই। যত দিন ধারণা ছিল এক এক মূল ধাতু এক এক রকম মূল-জিনিষ দিয়ে গড়া, প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ধরণের পদার্থ, ততদিন এক ধাতুকে আর এক ধাতুতে পরিণত করবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বিশ বছর আগে পদার্থের গড়ন সম্বন্ধে

বৈজ্ঞানিকেরা এই কথা বলেছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব হচ্ছে কতকগুলি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ মাত্র। এই মৌলিক পদার্থগুলি দেখে শুনে গুণে গেঁথে তাঁরা দিয়েছিলেন। মোট মাট তাদের সংখ্যা হবে ৬০।৭০টি*, প্রথমে অবশ্য এরও অনেক কম জানা ছিল। এই প্রত্যেক পদার্থ নিজস্ব ধাতুতে গড়া, তাদের আছে নিজস্ব ধর্ম্ম,—একটি যে আর একটিতে বদলে যাবে তার কোনই উপায় নেই। তামা হচ্ছে এই রকম এক মৌলিক পদার্থ, সোণা হচ্ছে আর এক মৌলিক পদার্থ, তামার সাথে সোনা মিশিয়ে তামার মর্য্যাদা একটু বাড়িয়ে দিতে পার কিম্বা সোণার সাথে তামা মিশিয়ে নীরস সোণা পেতে পার, কিন্তু তামাকে সোণা করা অসম্ভব অবৈজ্ঞানিক কল্পনা।

কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল মানুষের সমাজের মত প্রকৃতির রাজ্যে ওরকম জাতিভেদ নাই, উচচনীচ ধাতুতে অস্পৃশ্যভাব নাই। দেখা গেল ইউরেনিয়াম বলে একটা মৌলিক পদার্থ আপনা হতেই বদলে গিয়ে রেডিয়ম বলে আর একটি মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়—কালে এই রেডিয়মও যে আর একটি মৌলিক পদার্থে পরিণত হয় তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। একই ধাতু এ রকম করে বদলে বদলে সিসাতে গিয়ে যে পৌঁছুচেচ প্রমাণে সে কথাও পাওয়া গেল।

এ সব দেখে শুনে বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের পুরাণো ধারণা সব বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেন, তাঁরা খুঁজতে আরম্ভ করলেন এ ব্যাপারের কারণ। রেডিয়ম নিয়ে পরীক্ষা চলল। দেখা গেল রেডিয়ম থেকে এক রকম আলো কেবলই নির্গত হচ্ছে। জোনাকি পোকা বা কেঁচোর গায়ের থেকে যে রকম আলো বেরোয় সে রকম আলো এই রেডিয়মও ক্রমাগতই ভিতর থেকে ছড়িয়ে দিচেছ। কিন্তু এই আলো সাধারণ আলোর মত ঠিক এক নয়—এতে বিদ্যুতের স্বভাব পাওয়া যায়,

* বর্ত্তমানে হয়েছে নব্বই-এর কিছু উর্দ্ধে।

বিদ্যুতের যে ধরণ ধারণ এ আলোর রশ্মিরও সেই ধরণ ধারণ। অনেক রকম গবেষণা করে এই আলো থেকে তিন রকম রশ্মি পাওয়া গেল—প্রথম হচ্ছে (বিদ্যুৎ যে দুই রকমের আছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া আমরা প্রয়োজন মনে করলেম না) পজিটিভ বিদ্যুতের রশ্মি, তার নাম দেওয়া হল a-Ray (ক-রশ্মি) ; দ্বিতীয় হচ্ছে নেগেটিভ বিদ্যুতের রশ্মি, নাম হল b-Ray (খ-রশ্মি) ; আর তৃতীয় হচ্ছে শুধু আলোর রশ্মি, নাম c-Ray (গ-রশ্মি) ; আর এ তৃতীয়টিই হচ্ছে X-Ray বা Rontgen-Ray, যার সহায়ে পুরু আবরণের ভিতরে ঢাকা জিনিষও খোলা জিনিষের মত দেখা যায়। তার পরের গবেষণায় বের হ'ল এই যে ক-রশ্মি ও খ-রশ্মি তা কেবল রেডিয়মের গুণ নয় আরও অনেক মৌলিক পদার্থের ঐ গুণ আছে। ফলে বের হল যে, সব মৌলিক পদার্থেরই ঐ গুণ আছে। তবে সেটা লুকোন থাকে মাত্র। একটা মৌলিক পদার্থ যখন আর একটা মৌলিক পদার্থে পরিণত হতে থাকে তখন ঐ গুণটা দেখা দেয়, তা ছাড়া যখন পদার্থ স্থির সাম্য অবস্থায় থাকে তখন ঐ রশ্মি সবও একটি আর একটিকে কাটাকাটি করে সুপ্ত থাকে।

এ সব থেকে যে থিয়রী দাঁড়াল, তা এখন আমরা বলছি। আগে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থকে কতকগুলি বিশেষ পরমাণু-সমষ্টি বলে ধরা হ'ত। এই পরমাণুর ছোট জিনিষ আর নেই, এরা অবিভাজ্য, অটুট, অকাট্য, আলাদা আলাদা। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ এই একই রকম ভয়ানক শক্ত গোঁড়া পরমাণু দিয়ে গড়া। তাই পদার্থে পদার্থে যখন মিশ্রণ হয়, তখন বিভিন্ন রকমের পরমাণু পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়, কিন্তু কেউ কারোর মধ্যে মিলে মিশে যায় না। কিন্তু এখন স্বীকার করতে বাধ্য হতে হল যে পরমাণুও শেষ সীমা নয়। পরমাণু হচ্ছে বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টি। বিশেষ সংখ্যার বিশেষ রকমে সাজানোর উপর নির্ভর করে

এক এক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গড়ন ধরণ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সুতরাং এই সংখ্যার ইতর বিশেষ যদি আমরা করতে পারি, সাজানোর পদ্ধতিটা বদলে দিতে পারি তবেই এক মৌলিক পদার্থকে আর এক মৌলিক পদার্থে অনায়াসে পরিবর্ত্তিত করতে পারি। প্রকৃতিতে যে এই পরিবর্ত্তন হচ্ছে তাও ঠিক এই রকমে। রেডিয়ম যখন আলোক বিকিরণ করে, তার অর্থ সে তার বিদ্যুৎকণা সমষ্টি থেকে কতকগুলি বিদ্যুৎকণা ভেঙ্গে বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে—এই রকমে কতকগুলি বিশেষ সংখ্যার কণা ফেলে দিয়ে, বাকীগুলিকে নিয়ে নতুন ধরণে সাজিয়ে যখন সাম্য অবস্থা পায়, তখনই সেটা হয়ে পড়ে আর একটা মৌলিক পদার্থ। কিন্তু সমস্যা এই, প্রকৃতি এই কাজ করছে, কিন্তু কি রকমে তা জানি না। মানুষে যতদিন পরমাণুকে ভাঙ্তে না পারছে, ততদিন ত তার সোণার স্বপ্ন বিফল।

ভয় নাই, Dr. Rutherford আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। তার মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক ভেল্কীবাজ পরমাণুর গড়নের যে মানচিত্র এঁকেছেন সে কথাটা বলা দরকার। প্রত্যেক পরমাণু হচ্ছে একটা ক্ষুদ্রাকারে সৌর-জগৎ। সৌর-জগতের যেমন আছে সূর্য্য, তেমন পরমাণুরও আছে মধ্য ভাগে একটা কেন্দ্র বস্তু (nucleus) আর এরই চারিদিকে অসম্ভব বেগে গ্রহরাজীর মত ঘুরে ছুটে বেড়াচ্ছে যত সব বিদ্যুৎকণা (electron) সব পদার্থেরই বিদ্যুৎকণা একই ধরণের, পার্থক্য যা হয়, তা বিদ্যুৎকণার সংখ্যার ও সাজানোর পার্থক্যের দরুণ, আর এই কেন্দ্রবস্তুর ওজনের পার্থক্যের দরুণ। পদার্থের পরমাণুর যে পৃথক পৃথক ওজন তা সবই নির্ভর করে ঐ কেন্দ্রবস্তুর ওজনের উপর। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে বিদ্যুৎকণারা সব নেগেটিভ বিদ্যুৎ, আর কেন্দ্রবস্তুটি পজিটিভ বিদ্যুৎ; এই দুই শক্তির টান সমান ব'লে জিনিষকে স্থির ও সাম্য অবস্থায় দেখা যায়। পজিটিভ-বিদ্যুতে ভরা কেন্দ্র-বস্তুটিও

আবার দুই রকম বিদ্যুতের সমাহার। Dr. Rutherford দেখিয়েছেন যে এর এক ভাগ হচেছ্ হাইড্রোজেন নামক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কতকগুলি কেন্দ্র-বস্তু, আর এক-ভাগ হচেছ্ হেলিয়ম নামক পদার্থের পরমাণুর কতকগুলি কেন্দ্র-বস্তু। আর এ দুই ভাগ এমন শক্ত ক'রে আঁটা যে, সহজে এদের ছাড়ান যায় না। আমরা পূর্ব্বে যে তিন রকম বিদ্যুৎ রশ্মির কথা বলেছি, তার মধ্যে ক-রশ্মি ও খ-রশ্মি আসে কেন্দ্র-বস্তু হতে, আর গ-রশ্মি আসে বাইরের বাইরের বিদ্যুৎকণার সমষ্টি হতে। ক-রশ্মি হচেছ্ হেলিয়ম পরমাণুর রশ্মি, এর উপাদান দুইভাগ (charges) পজিটিভ বিদ্যুৎ। আর খ-রশ্মি হচেছ্ পরমাণুর রশ্মি, এর উপাদান একভাগ নেগেটিভ বিদ্যুৎ। এর মধ্যে ক-রশ্মিরই ওজন আছে—খ-রশ্মির খুব বেশী ওজন নয়, গ রশ্মির ত ওজনই নেই। সুতরাং কোন পরমাণু হতে যখন ক-রশ্মি বেরিয়ে যায় তখন তার ওজন কমে যায়—অর্থাৎ আর এক পদার্থের পরমাণু হ'তে চলে, কারণ পদার্থে পদার্থে যে মূল পার্থক্য তা এই পরমাণুর ওজনেরই মূল পার্থক্য।

ক-রশ্মিকে প্রকৃতি অবহেলায় বের করে দিচেছ্, কিন্তু এমন শক্ত ক'রে আঁটা পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুকে ভেঙ্গে ফেলা মানুষের সাধ্যাতীত ব'লেই প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু Rutherford সে কাজ করেছেন। রেডিয়মের ক-রশ্মির গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে তিনি কয়েকটি পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে ফেলেছেন। এই রকম করে নাইট্রোজেন এলুমিনিয়ম ফস্ফর প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থের পরমাণু থেকে হাইড্রোজেন কণা বের করে ধরেছেন। ভাঙ্গতে যে কি শক্তি দরকার তা বোঝা যাবে, যদি মনে রাখি যে ক-রশ্মির গুলির বেগ হচেছ্ সেকেণ্ডে প্রায় ৯000 মাইল।

তবেই দেখা গেল ভারী-পরমাণুকে ভেঙ্গে পাতলা পরমাণুতে

পরিণত করা যায়। সীসার পরমাণু সোণার পরমাণু থেকে ভারী; সুতরাং আশা করা যায় সীসাকে ভেঙ্গে একদিন সোণা পাওয়া যাবে।

কিন্তু প্রকৃতির গতি ভাঙ্গার দিকেই চলছে—মানুষের পক্ষেও ভাঙ্গাই সহজ। পাতলা পরমাণুর পদার্থকে ভারী করে কি রকমে ভারী পদার্থ পাওয়া যায় সে রহস্য এখনও বের হয় নাই। লোহা, তামা এসব হচ্ছে পাতলা-পরমাণুর পদার্থ। সুতরাং এ গুলিকে ভরাট করে সোণা তৈরী করা যাবে কি না, তাও এখন কিছু বলা যায় না। কিন্তু মানুষের অসাধ্য কি আছে?

কিন্তু পাতলা ধাতুকে ভারী ধাতুতে পরিণত করা যাক বা না যাক —ভারী ধাতুকে ভেঙ্গে পাতলা ধাতুতে পরিণত করার পথে মানুষ যে শক্তির সন্ধান পেয়েছে সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, যে শক্তি বলে পরমাণুর মধ্যে বিদ্যুৎকণা সব বিপুল বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও যে শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রে জমাট হয়ে আছে, তাকে মানুষ যদি বশ করতে পারে, তবে মানুষ যে কি শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে, তা কল্পনা করতেও মাথা ঘুরে যায়। পরমাণুগত এই শক্তির কথা আমরা বারান্তরে খুলে বলবার চেষ্টা করবো।

বিজলী, আষাঢ়, ১৩২৯

জড় আছে কি ?

প্রশ্নটি শুনে চমকে উঠলে চলবে না। জিনিসের একেবারে গোড়া ধরে টান দেওয়াই তো আজকালকার যুগধর্ম। যদি প্রশ্ন করতে পারি, আত্মা আছে কি না, ভগবান আছে কিনা, তাহলে জড়পদার্থ আছে কি না—এ প্রশ্নই বা তুলতে পারব না কেন ? অবশ্য বলতে পারেন, চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি—জড় আছে। কিন্তু চোখে তো অনেক জিনিসই দেখা যায়। সর্ষে ফুল দেখা যায়, আকাশকুসুম দেখা যায়, মরীচিকাও দেখা যায়। আর রোজই তো দেখছি—সূর্য্য উঠছে, ঘুরছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। চোখের দেখার খুব বেশী মূল্য নেই। ব্যাপারটা অন্যভাবে যাচাই করে দেখতে হবে দার্শনিকের পথে নয়, বৈজ্ঞানিকের পথেই।

জড় বলি কাকে ? জড়ের দুটি গুণ থাকা চাই এক আয়তন, আর এক ওজন বা ভার।* জড় বা পদার্থ জিনিসটা কি দেখবার জন্যে তাকে আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরা করেছি—কি বস্তু তার মধ্যে লুকিয়ে আছে কি বস্তু দিয়ে সেটা গড়া তা পরখ করবার জন্যে। ভাঙতে ভাঙতে আমরা আজকাল চলে গিয়েছি এমন ক্ষুদ্রের, এমন কণিকার জগতে যাকে চোখে তো দেখা যায়ই না, যন্ত্রেও ধরা যায় না—যাকে অনুমান করতে হয় অঙ্কশাস্ত্রের সহায়ে। আগের যুগে শাস্ত্রের সহায়ে যে রকমে প্রমাণ করা হতো ভগবানের বা আত্মার অস্তিত্ব, কতকটা সেই ধরণের।

* ইংরেজী mass ও weight পৃথক জিনিষ। massকে ভার আর weightকে ওজন বলতে চাই। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে এ পার্থক্য নির্দেশ প্রয়োজন হয় না—তাই ওজন ও ভার এক পর্য্যায়ে ব্যবহার করেছি।

আমরা এখন বলছি, জগতের আদি উপাদান হলো বিদ্যুৎ-কণিকা। বিদ্যুৎ দু শ্রেণীর (গুণ হিসেবে), যোগাত্মক (পজিটিভ), আর বিয়োগাত্মক (নেগেটিভ)। তাছাড়া আর এক শ্রেণীর কণা আছে যা কোন রকম বিদ্যুৎধর্মী নয়—তাদের বলা চলে অযোগাত্মক (নিউট্রন)। এই তিন শ্রেণীর কণাকে তিনটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। যে কণায় যোগাত্মক বিদ্যুৎ, তার নাম প্রোটন, যাতে বিয়োগাত্মক বিদ্যুৎ তার নাম ইলেক্‌ট্রন, আর যাতে কোন বিদ্যুৎ নেই তার নাম নিউট্রন। কণার আবার আর এক-রকম বিভাগ আছে, গু বা প্রকার নয়, অ' কার বা ভার অনুসারে। প্রোটন ও নিউট্রনের ভার আছে—প্রা . সমান, নিউট্রন কিছু বেশী; ইলেকট্রনের ভার খুব কম, এক রকম নেই বললেই চলে।

এ সকলকে বলছি কণা—এদের আর ভাগ করা চলে না, ভাঙ্গনের এখানেই শেষ। এ কণা কতকগুলো একসঙ্গে করে পরমাণু গঠিত হয়—যে পরমাণুকেই বহুদিন যাবৎ মনে করা হতো জড়ের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ—অ্যাটম (গ্রীকে কথাটির অর্থ অ-ছেদ্য)। প্রত্যেক পরমাণুর দুটি ভাগ—এক তার কেন্দ্র, আঁটি বা শাঁস, আর তার ঘের বা আবেষ্টন। কেন্দ্রে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন একান্ত দৃঢবদ্ধ হয়ে, আর তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রন-কণিকা। যতটি প্রোটন, ততটি ইলেকট্রন—বিদ্যুৎ-পরিমাণের সাম্য রাখবার জন্যে। এদের সংখ্যাই দেয় মৌলিকের বৈশিষ্ট্য—এর দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় বস্তুর রাসায়নিক গুণ ও ক্রিয়া। এই সংখ্যারই নাম আণব সংখ্যা এবং প্রত্যেক মৌলিকের রয়েছে পৃথক সংখ্যা। হাইড্রোজেন হলো প্রথম মৌলিক—কারণ এর একটিমাত্র প্রোটন (কেন্দ্রে), আর সঙ্গে একটিমাত্র ইলেকট্রন। সেই রকম লোহার হলো ২৬; কেন্দ্রে ২৬টি প্রোটন এবং চারদিকে ২৬টি ইলেকট্রন। সোনার ৭৯, পারদের

৮০ ; সোনা আর পারদের পার্থক্য একটি মাত্র কণা—লক্ষ্য করবার জিনিস। তাই চিরকাল কি প্রাচীন রস-বৈজ্ঞানিক (রস অর্থ পারদ আমাদের ভেষজ প্রাচীন শাস্ত্রে), কি আধুনিক রসায়নিক সকলে চেষ্টা করেছেন পারদকে কি ভাবে সোনায় পরিবর্ত্তিত করা যায়—পারদ থেকে শুধু একটিমাত্র কণা (প্রোটন) কমিয়ে নিতে হবে তো। সব চেয়ে ঊর্দ্ধ্ব সংখ্যা হলো ইউরেনিয়াম—৯২। এর পরেও দু-একটি মৌলিক পাওয়া গিয়েছে বটে, কিন্তু পরিমাণে খুবই কম এবং গুণেও একান্ত অস্থায়ী।

কেন্দ্রস্থ নিউট্রনের কথা বলিনি। সে আর এক অদ্ভুত রহস্য। প্রত্যেক মৌলিকের প্রত্যেকটি পরমাণুর আণব-সংখ্যা এক—অর্থাৎ তার যে বিদ্যুৎ-পরিমাণ তা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু পরমাণুর ওজন সমান নয়। সকল মৌলিকের নয় ; কিন্তু বেশীর ভাগ মৌলিকেরই। এক রকম হাইড্রোজেন আছে তার আণব-সংখ্যা এক বটে, কিন্তু ওজনে দ্বিগুণ। তাই ভারী জল বলে একরকম জল আছে, যা ভারী হাইড্রোজেন (আর অক্সিজেন) দিয়ে তৈরি। সব লোহার সংখ্যা ২৬, কিন্তু ওজন ৪।৫ রকমের আছে। সোনার সংখ্যা ও ওজন কিন্তু অপরিবর্তনীয়—ভারী সোনা কিছু নেই। অন্যপক্ষে পারদের ওজন ৮।৯ রকমের হতে পারে—ইউরেনিয়ামেরও তাই। এক রকম ওজনের ইউরেনিয়াম হতেই তো আণবিক বোমা তৈরি হয়েছে। একই মৌলিকের ওজনের তারতম্যের যে প্রকারভেদ হয় তাদের নাম দেওয়া হয়েছে আইসোটোপ (সম-ক্ষেত্রী)। এই অধিক ওজনের হেতু—নিউট্রন। প্রোটনের সঙ্গে যেখানে যত নিউট্রন সংযুক্ত থাকে তার অনুপাতে পরমাণুর আণবিক ওজন বেড়ে যায়, যদিও আণবিক বিদ্যুৎ-পরিমাণ সমানই থাকে। হাইড্রোজেনের একটি প্রোটনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যখন একটি নিউট্রন তখন তাই হয় ভারী হাইড্রোজেন, দ্বিগুণিত হাই-

ড্রোজেন ডিপ্লন বা ডয়টেরন। প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন—তা হলো প্রায় ১'৭ × ১০$^{-২৪}$ গ্র্যাম, অর্থাৎ ১০০০...২৫টি শূন্য—এতখানি ভাগের দেড়টি ভাগ।

তিন রকম মূল কণার কথা বলেছি। কিন্তু ভার আর বিদ্যুৎ-মান এই দুইয়ের বৈষম্যের দিক দিয়ে অদলবদল করে আরও অন্যান্য কণা পাওয়া যেতে পারে ও পাওয়া যায়ঃ–

(১) পজিট্রন, অর্থাৎ যোগাত্মক ইলেকট্রন—ইলেকট্রনের সমান ওজন (৯ × ১০$^{-২৮}$ এই পর্য্যায়ের), তবে বিয়োগ নয় যোগের বিদ্যুৎ।

(২) মেসন, বিদ্যুৎ-মান যোগ ও বিয়োগ উভয় প্রকারের হতে পারে। ওজন, ইলেকট্রন ও প্রোটন বা নিউট্রনের চেয়ে ১৮০ গুণ ভারী। তবে মেসন একাধিক ওজনের হতে পারে। এই দু-রকমের কণা আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে—এদের কথা পরে বলছি। এ ছাড়া আরও দু-এক রকমের সম্ভব হতে পারে। এই যেমন (ক) প্রোটনের বিপরীত, অর্থাৎ বিয়োগাত্মক প্রোটন—ওজনে সমান, বিদ্যুৎ-মান বিভিন্ন। (খ) বিদ্যুৎহীন, অর্থাৎ অযোগাত্মক ইলেকট্রন—বিদ্যুৎ-মান নেই, ওজন সমান—এর নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রিনো।

আরও দু-এক রকমের কথা বলা হয়—বিশেষতঃ ওজনের তারতম্যের দিক দিয়ে; কিন্তু তাদের অনিশ্চয়তা আরও অনিশ্চয়।

মেসনের কথা বল্লি। এই কণাটি একজন জাপানী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার। আর এই জন্যেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আমরা বলেছি—পরমাণু কেন্দ্রে দু-রকমের কণা শক্তভাবে আঁটা রয়েছে—প্রোটন আর নিউট্রন। এই এঁটে রাখার কাজ করে মেসন—ইট ধরে রাখে যেমন সিমেন্ট। নতুবা একই বিদ্যুৎ-মানের প্রোটন পরস্পর

থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ত। মেসনের অস্তিত্ব পৃথকভাবে স্বতন্ত্র অবস্থায় পাওয়া যায়—বিশ্ববিকিরণ (কসমিক-রে) নামক ব্যাপারটির মধ্যে। তবে এ স্বাধীন কণার আয়ুকাল বড় অল্প, তার প্রকৃতি অস্থায়ী, অনবস্থ।

তারপর পজিট্রন। পজিট্রনের অস্তিত্ব এক পাওয়া গিয়েছে আলোর কিরণ-রেখার মধ্যে। আলো হলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ—এ তথ্য আমরা বহুদিন জানি ; কিন্তু তা যে আবার কণাসমষ্টি—অন্যান্য পরমাণুর মত, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে সম্প্রতি (মোটামুটি এ কথা যদিও নিউটন বলে গিয়েছিলেন)। এই আলো-কণা বিশ্লেষণ করলে মেলে পজিট্রন আর ইলেকট্রন। পজিট্রন ও ইলেকট্রন মিলিয়ে সেকেণ্ডে দু'-লক্ষ মাইল (আলোর) বেগে ছুটিয়ে দিলে দেখা দেয় আলো-কণা রূপে।

এ পর্য্যন্ত আমরা সব রকম কণার কথা বলেছি জড়ের উপাদান হিসেবে—আলোর কণা উল্লেখ করি নি। আলো-কে জড় থেকে সাধারণতঃ ভিন্ন পর্য্যায়ে ফেলা হয় - যদিও তার কণা আছে তবুও তা হলো ক্রিয়াশক্তি। অন্যান্য জড়-কণা থেকে আলো-কণার বৈশিষ্ট্য আছে। আলোতে বিদ্যুৎ-মান নেই আদৌ—নিউট্রনেরই মত, তবে তার ভারও নেই। ইলেকট্রন বা পজিট্রনের ভার যা সে ভারটুকুও নেই। আলো-কণার আর এক বৈশিষ্ট্য—তাকে স্থির অবস্থায় কখনও পাওয়া যায় না, সর্ব্বদা সে চলমান। এই জন্যে আলোর কণা থাকলেও তাকে জড়াতিরিক্ত বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। ফলতঃ এখন তাই অনেকে বলতে সুরু করেছেন যে, জড়ের স্বরূপ হলো "নিউট্রন"। নিউট্রনই আদি পদার্থ, মূল জড় কণা। আর সব কণাকে আলোকণার মত ক্রিয়া-শক্তি, জড়ের বা জড়াশ্রিত কর্ম্মবেগ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বতন কালে জড় আর জড়ের শক্তি বলে দু-রকম জিনিসের যে পার্থক্য দেখানো হতো সে পার্থক্য এখনও বজায় থাকতে পারে। মাঝে

কিছুকাল হয়তো জড় পদার্থকে পাওয়া যাচ্ছিল না—পাওয়া যাচ্ছিল কেবল বিদ্যুৎ-কণাকে, বিদ্যুৎ-শক্তিকে। এই বিদ্যুৎ-শক্তির চরমে হলো আলো (দৃশ্য বা অদৃশ্য)—একদিকে জড়ের অ-জড় প্রান্তে আলো—অন্য প্রান্তে, অর্থাৎ জড়-প্রান্তে নিউট্রন। নিউট্রন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জড় (স্থূল জড়) আবার আসন পেয়েছে—যদিও এ জড় ঠিক পূর্ব্বতন জড় কি না, সন্দেহ আছে। কারণ নিউট্রনও যে অবিভাজ্য জড়কণা সে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেছেন নিউট্রন হলো প্রোটন আর ইলেকট্রনের সমবায়।

তবে হরে দরে বলা চলে যে, জড়ের বা পদার্থের মূল প্রকৃতি হলো বিদ্যুৎ-মাত্রা। এ বিদ্যুৎ-মাত্রা যে নিরেট জড়ই এক হিসেবে, তার প্রমাণ—তার রয়েছে ওজন—ইলেকট্রন বা পজিট্রনে যত কমই তা হোক না কেন। এক, আলোর ওজন নেই, যদিও তা বিদ্যুৎ-মাত্রার সমবায়—তাই চেষ্টা হয়েছে আলো-কণাকেও যথাসম্ভব জড়ধর্মী করে তোলা যায় কি না। আলোর ভার নেই বলা হয়; কিন্তু ভারের যা গুণ আলোর মধ্যে তা পাওয়া যায়। ভার অর্থ কি? আকর্ষণ। পদার্থ—জড়-পরিমাণ পরস্পরকে আকৃষ্ট করে, নিউটনের তথ্য। আলোকণাও আকৃষ্ট হয়। আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন, কোন তারা থেকে সূর্যের পাশ দিয়ে যে আলো-রশ্মি আসে পৃথিবীতে—সে সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেঁকে যায় সূর্য্যের দিকে, যেন সূর্য তাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু, কিন্তু আছে এর মধ্যে। এই যে আলো-রেখার বক্রতা—তার পরিমাণ কতখানি? মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে যে পরিমাণ হওয়া উচিত তার সঙ্গে এই পরিমাণের নাকি পার্থক্য আছে, পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। তাছাড়া আরও বলা যেতে পারে, জড়ে জড়ে আকর্ষণ হয় বটে; কিন্তু আকর্ষণ হলেই যে তা জড়ত্বের পরিচয়, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। আইনষ্টাইন নিজেই অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আলো-রেখা বাস্তবিক

বেঁকে যায় না—ক্ষেত্রটিই বাঁকা ; তাই দেখায় আলো যেন বেঁকে গিয়েছে। আইনষ্টাইনের এই নব মাধ্যাকর্ষণ-বিধি জড়কে কতখানি জড়ধর্মী করে রেখেছে?

জড়ের আর এক লক্ষণের কথা আমরা বলেছি—তার আয়তন। আয়তন আজকাল ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম হয়ে তো গিয়েছেই—তাছাড়া কেবল মাত্রায় নয়, গুণেও ; বস্তুর আয়তন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। আয়তন বলছি—কিসের আয়তন? কণা, মূলকণার। কণা কি? অবিভাজ্যতম অংশ—আর তার স্বরূপ হলো তরঙ্গ। তরঙ্গ অর্থ, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য। দৈর্ঘ্য আছে সুতরাং বোধগম্য আয়তনও আছে। এই দৈর্ঘ্যের একটা গাণিতিক সূত্রও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই যে দৈর্ঘ্য তা কণার আর একটি ধর্মের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় কি করে? আর একটি ধর্ম এই যে, কণা হলো বিন্দু—জ্যামিতিক বিন্দু ; যার স্থান আছে বটে, কিন্তু নেই পরিমাণ। বিজ্ঞানকে আজ এই পরস্পর বিরোধী হলেও উভয় তত্ত্বকে মেনে নিতে হয়েছে। অনেকে বলছেন, তরঙ্গ বাস্তবিকই কিছু আছে কিনা সন্দেহ ; ওটা হল মাপের কৌশল মাত্র --জ্যামিতিক স্বীকার্যের (postulate) বেশী মর্যাদা ওর নেই। যদি আপত্তি ওঠে, সত্যিকার আয়তন বা ব্যাপ্তি যদি না থাকে তবে কণাগুলো মিলে অণু ও পরমাণু গড়ে কি করে? উত্তরে বলবো—ব্যাপ্তিহীন বিন্দু মিলে রেখা এবং প্রস্থহীন রেখা মিলে ক্ষেত্র তৈরি হয় কি রকমে? তবে দাঁড়ায়, যাকে এখনও জড় বলি—বিদ্যুৎ-কণা, এমন কি নিউট্রন পর্য্যন্ত—তার শেষ রূপ দেখছি আলোরই মত—আয়তন, ভার বর্জিত। আয়তনের কথা বললাম—ভারও শেষে দেখা যাবে—আসল ভার নয়, শুধু চাপ মাত্র—যেমন জড় বা অজড় সকল ক্রিয়াশক্তিরই থাকে। তারও প্রমাণ এর পক্ষে মিলেছে। এতদিন সিদ্ধান্ত ছিল—ভার অর্থ বস্তুর অন্তর্গত পদার্থের পরিমাণ, বস্তুর বস্তু— আর তা অপরিবর্ত্তনীয়।

তা সর্ব্বদা সর্ব্ব অবস্থায় একই থাকে। যে সংখ্যা দিয়ে পরমাণুর ভার নির্দেশ হয় (আণব-ভার) তার ইতর বিশেষ হয় না কখনও। এ কথা বদলে গিয়েছে আইনষ্টাইনের দৌলতে। তিনি প্রমাণ করেছেন—ভার ও গতিবেগের মধ্যে সহযোগ ও সমানুপাত। গতি যত বেড়ে যায়, ভারও তত বেড়ে চলে। গতিবেগ যদি হয় অসীম, ভারও তবে হয়ে ওঠে অসীম। অবশ্য এই বৃদ্ধি এত সামান্য যে সহজে ধরা পড়ে না, গণনার মধ্যে আনা হয় না। তবুও সমস্যাটির মীমাংসা অত সহজে হয় না। কারণ আপত্তি ওঠে, তাই যদি হবে তবে আলো-কণার ভারও তো বেশ কিছু হওয়া উচিত—কারণ তার গতি প্রচণ্ড, তার চেয়ে বেগ-বান আর কিছু নেই (সেকেণ্ডে দুলক্ষ মাইল)। কিন্তু এই এতখানি "ভারী" আলো-কণা এত অসংখ্য পরিমাণে আমাদের গায়ের উপর এসে চেপে পড়ছে, অথচ সে চাপ আমরা অনুভবই করি না। এর একমাত্র জবাব—বিসমিল্লায় গলদ—আলো-কণার তো ভারই নেই; শূন্যকে অসীম দিয়ে গুণ করলে শূন্যই হয় ($0 \times \infty = 0$; কোন কোন ক্ষেত্রে $0 \times \infty = \infty$ হতে পারে বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হয় নি)।

মোটের উপর তা হলে বলতে পারা যায়—আলো-কণা (ফোটন) আর বিদ্যুৎ-কণা (তা নিউট্রন, অর্থাৎ যার বিদ্যুৎ-বৃত্তি নাই, ভার আছে, তাই হোক না) এই যে পার্থক্য করা হয়, জড় আর জড়ের শক্তি এই দুয়ের পার্থক্য বজায় রাখবার জন্যে, তার ন্যায্যতা আছে কি না সন্দেহ। বস্তু-ভারকে সম্পূর্ণভাবে ক্রিয়াশক্তিতে পরিবর্ত্তিত করা যায়, আবার ক্রিয়া-শক্তিকেও বস্তুভাররূপে রূপান্তরিত করা যায়। আলো-কণা বিদ্যুৎ-কণায়, বিদ্যুৎ-কণা আলো-কণায় পরিণত হয় অক্লেশে। আর এই রূপান্তর যে বৈজ্ঞানিকের কারচুপি, ঘটে কেবল কারখানায়—পরীক্ষাগারে, তা নয়। প্রকৃতির ক্ষেত্রেই তা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিশ্বজ-রশ্মির উল্লেখ আমরা ইতিপূর্ব্বে করেছি। অনেক অনেক অদ্ভুত

বার্তা তা নিয়ে এসেছে। আলোর কণাই হয়তো সেই বিশ্বব্যাপী আদি পদার্থ যা সৃষ্টির মূলে, যা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের আরম্ভ। বিজ্ঞানের এক যুগে নীহারিকার কথা খুব বলা হতো—একটা ধূমজাতীয় বাষ্পীয় বস্তু যা ক্রমে তাপ হারিয়ে শীতল হয়ে, জমাট বেঁধে কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে, এই দৃশ্যমান গ্রহনক্ষত্রপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান চলেছে এই সিদ্ধান্তের দিকে যে, ওই নীহারিকা আলোপ্রপাত ছাড়া আর কিছু নয়।

বিজ্ঞানের বহির্দৃষ্টি অবশেষে অধ্যাত্মের অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করেছে কি ? উপনিষদ বলছে, প্রথমে—অন্নমসি জ্যোতিরসি—তুমি জড় তুমি জ্যোতি—এক প্রান্তে জড়, অন্য প্রান্তে জ্যোতি; কিন্তু পার্থক্য কেন—এর সত্যতা, সার্থকতা নেই—

সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে (বৃহদারণ্যক)—সব বস্তুই জ্যোতির মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে পায় তাদের মহত্তম সত্তা।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুলাই, ১৯৫০

আলোর স্বরূপ

নানাদিক থেকে আলোর প্রকৃতি অতি বিচিত্র। প্রথমতঃ, একে বস্তু বলব না অবস্তু শক্তি বলব? বস্তু অর্থ এমন জিনিস যার ভার আছে; যে বাধা দিতে পারে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম যে বস্তু, সবচেয়ে কম ভার জড়-কণা—তার নাম হলো ইলেকট্রন, আর তার দোসর পজিট্রন। ইলেক্-ট্রন হলো ক্ষুদ্রতম নেগেটিভ বা বিয়োগ-তড়িৎকণা, আর পজিট্রন হলো তার বিপরীত রূপ, পজিটিভ বা যোগ-তড়িৎকণা। বলা হয়, এদের ভার একরকম নেই। একরকম নেই বটে, তুলনায় তবু কিছু আছে। কিন্তু আলো-কণা? আলো-কণার ভার আদৌ নেই। ভার জিনিষটা হলো সংহত বা অচল শক্তি—ভারকে কমিয়ে কমিয়ে, অর্থাৎ ব্যয় করে শক্তিতে পরিণত করা যায়। আলো হলো বস্তু-কণা যা সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে, তার সব ভার হারিয়ে বা রূপান্তরিত করে। আলোর ভার নেই বটে, কিন্তু চাপ আছে—অর্থাৎ তার আছে ধাক্কা দেবার, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা। এই হিসাবে বস্তুর মত তার আছে বাধা দেবার শক্তি। একটা আলো-কণা যদি বেগে সোজা এসে পড়ে একটি ইলেকট্রন মণ্ডলীর মধ্যে, তবে ধাক্কার ফলে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় একদিকে, নিজেও যায় অন্যদিকে সরে। (এরই নাম দেওয়া হয়েছে Compton effect)। আরো দেখা গেছে, আলোর উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আছে। মাধ্যাকর্ষণ অর্থ জড়পিণ্ডের উপর জড়পিণ্ডের টান। সূর্য পৃথিবীকে

টানে, পৃথিবীও সূর্যকে টানে ; সকল জিনিস পরস্পর পরস্পরকে টানে। টানের জোর নির্ভর করে ভার বা বস্তু পরিমাণের উপর (এবং দূরত্ব বা নিকটত্বের উপর)। দেখা গেছে, বহুদূর থেকে কোন তারায় কিরণরেখা যদি সূর্যের পাশ দিয়ে চলে আসে তবে সেখানটায়, সূর্যের পাশে আলোরেখা যায় বেঁকে ; অর্থাৎ সূর্য তাকে আকর্ষণ করে ঠিক জড়বস্তুর মত। তাহলে, আলোর জড়ের মত ভার নেই অথচ জড়ের মত চাপ আছে।

জড়ের আর একটি ধর্ম হলো গতি-বৈষম্য ; অর্থাৎ কখনও চলে জোরে, কখনও চলে ধীরে। কিন্তু আলোর গতি সর্বদা, অর্থাৎ ফাঁকায় যখন চলে তখন সমান—তার কম বেশী নেই। যে জড়-আশ্রয় থেকে আলো বের হয়ে ছুটছে, তাকে তুমি জোরে চালাও বা ধীরে চালাও, তাতে আলোর বেগের ব্যতিক্রম কিছু হবে না—তা চলবে সমানে, কোন ইতরবিশেষ হবে না। জড়কণা এ ধর্ম অনুসারে চলে না—তার গতি তার উৎপত্তিস্থলের গতি-নিরপেক্ষ নয়—জড়ের যে ক্ষুদ্রতম কণা ইলেকট্রন ইত্যাদি তাদেরও গতি এই রকম বদ্ধ বিষম-গতি। মনে হয়, আলো যখন একবার বের হয়ে এসেছে তার আশ্রয় হতে, পরে মুক্ত সে, তখন আশ্রয়ের কোন বন্ধন বা টান তার নেই—সে চলে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে। "মলি মাইকেলসন" পরীক্ষার মূল তত্ত্ব এই। তাই আলোর গতি তীব্রতম গতি—এর চেয়ে বেগে আর কিছু চলে না—বেগের সীমানা যেন আলোর বেগ।

এক সময় আলোতে আর জড়বস্তুতে আর একটা পার্থক্য অবশ্য দেখান হতো। জড়বস্তু হলো বিভাজ্য, কণার সমষ্টি। ভাগ করতে করতে শেষে পৌঁছে যাই যেখানে তাই হলো তড়িৎকণা—সব তড়িৎ শক্তির এক একটি বিন্দু। কিন্তু আলোরেখা সম্বন্ধে বলা হতো—তা কণা-সমষ্টি নয়, তা হলো টানা প্রবাহ, তরঙ্গের ধারা। রশ্মি অর্থ

তরঙ্গায়িত রেখা। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত পুরাপুরি চললো না। এখন দেখা গেছে, আলোক-রশ্মির ধর্ম দু-রকমই—একদিকে তরঙ্গ-ধর্মী বটে; কিন্তু আর একদিকে কণা-ধর্মী। আলোর কতকগুলো গুণ বা ক্রিয়া যথাযথ ব্যাখ্যা করা যায়, যদি তাকে তরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করি; আবার অন্যরকম গুণের জন্যে প্রয়োজন—কণা হিসাবে ব্যাখ্যা। এই যেমন, ধাক্কার ফলে আলোরেখা একটা বিদ্যুৎকণাকে স্থানচ্যুত করে দিতে পারে, নিজেও ছিট্‌কে যেতে পারে—এ ক্রিয়াটি (diffraction) আলোরেখাকে কণা সমষ্টিরূপে দেখলেই ভাল বুঝতে পারি। অন্যদিকে আলোর আছে আরোপণ (interference) এবং বিক্ষেপণ ক্রিয়া। অনেক সময় দেখা যায়, দুটি আলোরেখা মিলেমিশে উজ্জ্বলতর আলো সৃষ্টি করে না, করে অন্ধকারের সৃষ্টি—কাটাকাটি হয়ে যায়। একে বলা হয় আরোপণ। এ রকম ঘটে, যখন দুটি তরঙ্গ মাথায় মাথায় সমানে না চলে, চলে বিষম পদে; অর্থাৎ একটির মাথা আর একটির কোলের সঙ্গে। আর বিক্ষেপণ হলো এই যে, আলো সোজা টানা ঋজু রেখায় সামনে বরাবর চলে না—সে চলে নিজেকে আড়াআড়ি ছড়িয়ে বা এপাশ-ওপাশ, এ-দিক ও-দিক করতে করতে। সেজন্যেই দেখি, আলো ও ছায়ার সীমানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়—সীমানা একটা আবছায়া, অর্থাৎ আলোছায়ার মিশ্রণ। অন্য কথায়, আলোরেখা কোণ ঘুরে চলতে পারে; আলোক-তরঙ্গ আলো যেদিকে চলে সেই গতিরেখার উপর আড়াআড়ি হয়ে পড়ে। কিন্তু আলোর এই যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, এখন আর তা বলা চলে না। কারণ, জড়কণা অর্থাৎ বিদ্যুৎ-কণারও আজকাল তরঙ্গধর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। আলো-শক্তি হোক আর জড়কণা হোক, উভধর্মী—কণা ও তরঙ্গ সমানে তারা। এতে বিপত্তি ঘটেছে কিছু, কিন্তু তা হলো আধুনিকতম বিজ্ঞানের উত্তম রহস্য।

যাহোক, একটা পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য আমরা এখনও বজায় রেখেছি —বলেছি ইতিপূর্বে, কণা হোক তরঙ্গ হোক, জড়বস্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন বেগে চলে। তার গতিমাত্রার তারতম্য আছে ; কিন্তু আলোর কণা বা তরঙ্গ চলে সর্বত্র সমান বেগে। তবু আলোর রেখার মধ্যেও বৈষম্য একটা স্বগত ভেদ আছে অন্য দিক দিয়ে। আলোরেখা যদি হয় তরঙ্গ-সমষ্টি, তবে পার্থক্য আসে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নিয়ে, তার সম্পাত-সংখ্যা (frequency) নিয়ে। আমরা জানি সাদা আলোকরশ্মিতে আছে সাতটি রঙের ধারা। সাতটি বিভিন্ন রঙের সাতটি রশ্মি মিলেমিশে হয়ে যায় একটি সাদা রশ্মি। এই যে বিভিন্ন রং তা নির্ভর করে ঠিক তরঙ্গের মাপ অনুসারে। তরঙ্গ ছোট বড় আছে, যদিও সকলের গতি সমান। সবচেয়ে বড় ঢেউ হলো লাল রেখার, সবচেয়ে ছোট ঢেউ বেগুনী রেখার—লাল, কমলা, হলুদে, সবুজ, নীলিমা, নীল, বেগুনী—মোট এই সপ্তক্রম বা সপ্তক। লাল ঢেউ এক একটির দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের দশ হাজারের এক ভাগ, আর অন্য প্রান্তে বেগুনী হলো তার অর্ধেক—অর্থাৎ কুড়ি হাজারের এক ভাগ। কিন্তু এ ছাড়া আছে আবার অদৃশ্য আলো—তাদেরও ঢেউ সব আছে—দুই প্রান্তের পরে হ্রস্বতর ও দীর্ঘতর সব। দুই সীমানার বাইরে প্রসারিত যে প্রায় অন্তহীন শ্রেণী তা আমাদের চোখে পড়ে না। মাঝখানের একটু অবকাশ শুধু আমরা দেখি—দুই দিকে অব্যক্ত, মধ্যে একটুখানি ব্যক্ত—'ব্যক্ত মধ্যানি ভারত' (গীতা)। দীর্ঘতর অদৃশ্য ঢেউ ব্যবহৃত হয় বেতারে (রেডিওতে) ; এক একটির দৈর্ঘ্য অনেক সময়ে কুড়ি পঁচিশ মাইলও পেরিয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে হ্রস্বতর অদৃশ্য ঢেউ ব্যবহৃত হয় রন্টগেন্ রশ্মি বা এক্স-রে হিসাবে, অস্বচ্ছ বস্তু ভেদ করে তার ভিতরকার খবর যাতে দেখায়। এই ক্ষুদ্র ঢেউ সব দৃশ্যতঃ ক্ষুদ্রতম যে বেগুনী ঢেউ তার অন্ততঃ দশ গুণ ছোট ;

অর্থাৎ $\frac{১}{১00,000,000}$ সি-এম*, তারপর গামারশ্মি আছে, আরো আছে ব্যোম-রশ্মি। এদের পরিমাপ আরো হাজার গুণ ছোট। তাহলে দাঁড়ালো এই—আলোর গতি সর্বদা (অর্থাৎ শূন্য অবকাশে) সমান এবং সর্বাপেক্ষা অধিক—যদিও তার ছন্দ বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। বিদ্যুৎকণার (জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশ) গতিবেগ বিভিন্ন পর্যায়ের এবং তার তরঙ্গের মাত্রাও বিভিন্ন পরিমাপের। একথা সত্য, বিদ্যুৎকণা কখন কখন পেয়ে বসে প্রায় আলোর বেগ। ফলতঃ দেখা গেল, আলো-কণা হলো বিয়োগ-বিদ্যুৎকণা (ইলেকট্রন) আর যোগ-বিদ্যুৎ-কণা (পজিট্রন) এই দু-এর সংমিশ্রণ, এরা যখন লাভ করে আলোর বিশিষ্ট গতিবেগ।

আলোকণা যে এতখানি বেগ পায় তার হেতু আলোচনার পথে আর একটি তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে আলোকণা ও বিদ্যুৎকণার পার্থক্যও আর এক হিসাবে স্পষ্ট হয়েছে। রহস্যটি তাহলে বিশদ করে বলা যাক।

জড়ের বা জড়ক্ষেত্রের মূল উপাদান এই যে কণা, তার একটি গতির কথা আমরা বলেছি শুধু—সোজা গতি, দৃশ্যতঃ সোজা বা—

* এই একই পার্থক্য দৈর্ঘ্যের পরিবর্তে সম্পাত-সংখ্যা বা পৌনঃপুনিক দিয়ে নির্দেশ করা যেতে পারে ; অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে একটি স্থান (বা বিন্দু) দিয়ে কতকগুলি ঢেউ চলে যায়। লালের সম্পাত-সংখ্যা হলো ৪×১০^{১৪} (৪ এর পরে ১৪টি শূন্য), বেগুনীর ৮×১০^{১৪} (৮ এর পরে ১৪টি শূন্য)। বেগুনী ছাড়িয়ে এক্স রশ্মির সংখ্যা ১০০ কোটি কোটির কোঠায় যায়। আর নীচে রেডিও তরঙ্গ ১০০ থেকে ৮০০ হাজারে নামে।

একে অন্যের চার দিকে। এর নাম দিতে পারি অয়ন। কিন্তু আর একটি গতি আছে, যাকে বলা যায় ঘূর্ণন, অর্থাৎ নিজের চারিদিকে ঘোরা। চারদিকে ঘোরা। পৃথিবীর আছে যেমন দুটি গতি আহ্নিক ও বার্ষিক—সূর্যকে প্রদক্ষিণ আর নিজেকে প্রদক্ষিণ। নিজের চারিদিকে ঘোরা মানে লাট্টুর মত ঘোরা। ঘূর্ণনের ঠিক অর্থ কি? একগাছি দড়ির মাথায় একটি ঢিল বেঁধে যদি তাকে ঘোরাতে থাকি চারদিকে, তখন কি বোধ করি? বোধ করি ঢিলটা ছুটে চলে যেতে চায়, আর আমি টেনে রাখছি; ছেড়ে দিলে সোজা চলে যায় এক পাশ কেটে যাকে বলে স্পর্শ রেখা (tangent) তাই ধরে। তাহলে দেখা যায় দুটা টান রয়েছে। জিনিষ যখন ঘোরে বৃত্তাকারে—একটা কেন্দ্র-মুখী আর একটা কেন্দ্রবিমুখী—এই দুটির সংযোগ-ফল হলো গতির বৃত্তপথ। কেন্দ্রবিমুখী যে গতি তার যে বেগ বা জোর, তাকে একটা বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। যে পরিমাণ জোরে বৃত্তপথ থেকে একটা জিনিষ ছুটে চলে যেতে চায়, তা হলো angular momentum সোজা ভাষায় spin বা কৌণিকপ্রবেগ (ঝোঁক)। কিন্তু এখন যে বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে তা এই—যে রকম বিদ্যুৎকণা হোক, বিদ্যুৎ-পরিমাণ, ভার-পরিমাণ বা গতিপরিমাণ তার যাই হোক, সকলেরই এই আবর্ত্ত বেগ সমান। এখানেই সকল জড়বস্তুর মূল উপাদানের ঐক্য ও একত্ব। কিন্তু আলোকণার বৈশিষ্ট্য তার আবর্ত্ত-বেগ বিদ্যুৎকণার আবর্ত-বেগের ঠিক দ্বিগুণ।

যাহোক, আলোর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে যা বলা যায় এখন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে তা সংক্ষেপতঃ এই*—

* এ বিষয়ে কিছু নতুনতর আলোকপাত হয়েছে। তার মর্ম এই—আলো-কণার আবর্ত্ত-বেগ সবচেয়ে বেশী সন্দেহ নেই, কিন্তু বিদ্যুৎকণার আবর্ত্ত-বেগে তারতম্য আছে।

(১) আলোর মত দ্রুতগামী বার্তাবহ আর কিছু নেই।

(২) চলবার জন্যে আলোর কোন বাহন বা অবলম্বন প্রয়োজন নেই।

(৩) বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সব চেয়ে বিশুদ্ধতম রূপ হলো আলো, ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণের জন্যে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্রিয়া চলে গতিমান জড়কণা আশ্রয় করে—এই রকম জড়কণা সব ঘিরে বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাবের ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু জড়কণা থেকে নিঃসৃত হবার পর আলো চলে নিজের মত—মুক্ত, স্বৈরিণী, যেন "বন্ধনহারা কুমারীর বেণী।" তার ক্ষেত্রের তাই শুধু অবাধ প্রসার।

(৪) আলোই প্রকট, পরিস্ফুট করেছে কণা ও তরঙ্গের সম্মিলিত দ্বৈতরূপ।

(৫) আলো হলো জড়ের সূক্ষ্মতম—সবচেয়ে বেশী অ-জড় রূপ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

নতুন কণা মেসোটন বা মেসন প্রায় আলো-কণার আবর্ত্ত-বেগে পৌঁছেচে—এ রকম অনুমান করা হয়। এ হলো ভারী, যোগাত্মক ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের পর্যায়ে, কিন্তু ইলেকট্রনের বিপরীত। ইলেকট্রন হলো প্রায় ভারশূন্য ও বিয়োগাত্মক। আলোর আবর্ত্তবেগ পেতে পারে মেসন বা মেসোটন। তবে বিদ্যুৎ চাপ শূন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রিনো বা নিউট্রেটো : অন্য কথায় এ হবে ভারী আলো।

কালের মাপ

'—বৎসরে কি কালের মাপ?'

—বঙ্কিমচন্দ্র

একটি জিনিষ ঘটল, তার পরে ঘটল আর একটি। আমাদের স্বাভাবিক ধারণা ও বিশ্বাস এই, যে জিনিষ আগে তা সর্ব্বদা আগেই, যে জিনিষ পরে তা সর্ব্বদা পরেই। এই পারম্পর্য্যের সম্বন্ধ কখনও উল্টে যায় না। তোমার গালে চড় কসে দিলাম, তুমি হলে ধরাশায়ী; এঘটনা কখনও এমন হতে পারে না যে, আগে তুমি ধরাশায়ী, পরে চড় এসে পড়ল তোমার গালে!

বাস্তবিকই, দুটি জিনিষ ঘটে এক সঙ্গে কিন্তু আমাদের কাছে বোধ হয় পর পর—এরকম উদাহরণ আমরা জানি। বিদ্যুৎ আর মেঘগর্জ্জন, ধোপার কাপড়-কাচা, যা দেখা ও শোনা যায়—ঘটে বাস্তবিক এক সঙ্গে কিন্তু বোধ হয় পর পর। অন্য ধরনের উদাহরণ ধরা যাক একটা। দুই জায়গায় দুটি আলো জ্বলে উঠলো—ধর একটি কলকাতায় আর একটি শিলং-এ; তাদের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়—ঢাকায় বসে একজন। সে দেখলে দুটি আলো জ্বললো এক সঙ্গেই। কিন্তু কলকাতায় বসে যে, সে কি রকম দেখবে? সে দেখবে কলকাতার আলো আগে জ্বললো, তার পরে জ্বললো শিলং-এর আলো। আবার শিলং-এ যে, সে দেখবে শিলং-এ আগে আলো জ্বললো, পরে কলকাতায়। এর মধ্যে কোন ঘটনাটি ঠিক? তিনটিই সমান সত্য ঘটনা—একটি সত্য আর দুটি সত্য নয়, এমন বলা চলে না। তা হলে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, আগে পরে বলে অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ কিছু নেই। যে জিনিষ এক জায়গা থেকে আগে, অন্য জায়গা থেকে পরে, তৃতীয় এক জায়গা থেকে

তা যুগপৎ। এই পার্থক্য নির্ভর করে দর্শকের স্থানের উপর। কারণ আলোর আছে একটা নির্দিষ্ট গতি এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছুতে তার সময় লাগে। সুতরাং যে স্থান যত দূরে আলোর সেখানে যেতে আসতে সময়ও লাগে তত বেশী। এ সব উদাহরণে দর্শক স্থির হয়ে আছে, সমস্ত ব্যাপারটিও ঘটছে একটা স্থির ক্ষেত্রের মধ্যে; তাই জটিলতা বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু জটিল হয়ে ওঠে তখন, যখন দেখি আলোও ছুটছে (অর্থাৎ আলোর উৎপত্তি স্থান) আর দর্শকও ছুটছে—তাতে আবার এক নয়, বহু দর্শক।

ধর, একখানি রেলগাড়ী ছুটছে। লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে দুটি ডাকাত—কিছু দূরে দূরে, গাড়ীটা যতখানি লম্বা। একজন গুলি করল ইঞ্জিন চালককে, আর একজন করলো গার্ডকে। ট্রেনের ঠিক মাঝ-খানের কামরায় বসে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক, শুনলেন দুটি আওয়াজ এক সঙ্গে। তা হলে তুমি হয়ত বলবে, ডাকাত দুজন একসঙ্গে গুলি ছুঁড়েছে। কিন্তু সেই সময়েই গুমটিওয়ালা আবার ছিল লাইনের পাশে, ডাকাত দুজনার মাঝামাঝি। সে শুনলো আগে যে গুলি গার্ডের লাগলো। গাড়ীখানি ছুটছে গার্ডের দিক থেকে ড্রাইভারের দিকে। সুতরাং যে গুলিতে গার্ড মারা গেল তার শব্দ মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছুতে বেশী দূরে যেতে হবে এবং সময়ও বেশী লাগবে, যে গুলিতে ড্রাইভার মরলো তার শব্দের চেয়ে। সুতরাং গুমটিওয়ালার কথাও ঠিক আর মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কথাও ঠিক। এ ক্ষেত্রেও বলা চলে না যে, এক জনেরই কথা ঠিক আর এক জনের কথা বেঠিক।

গতি ও কালের যে গোলমেলে সম্বন্ধ তার আর একটি উদাহরণ ধরা যাক।* একটা দৌড়ের গোল-ছক (ট্র্যাক)। দুজন ছুটছে

* এই দুটি উদাহরণ মূলতঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল থেকে গৃহীত।

দুটি লাইন ধরে—একটি ভিতরে আর একটি বাইরে। বলা বাহুল্য বাইরের পরিধিটি দীর্ঘতর, ভিতরেরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। দুজনেই ঠিক পাশাপাশি সমানে ছুটছে—কেউ আগে, কেউ পরে নয়। ভিতরের জন ছুটছে ঘন্টায় ৮ মাইল করে; সমান তাল রাখবার জন্য বাইরের জনকে ছুটতে হচ্ছে আরো ৮ মাইল জোরে। দূরে দাঁড়িয়ে তুমি দেখছ। তুমি তাহলে মনে করবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ছুটছে ঘন্টায় ১৬ মাইল হিসেবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা ঘটে না। কি রকম? আচ্ছা ধর, তোমার কাছে আছে একটি ঘড়ি আর ভিতরের লাইন দিয়ে যে চলছে তার কাছে একটি, আর বাইরের লাইনের লোকটির কাছেও একটি। তিনটি ঘড়িতেই সমান সময়, চলে ঠিক ঠিক। ভিতরের লাইনে যে চলেছে তার বেগ ঘন্টায় আট মাইল, অর্থাৎ মিনিটে ৭০৪ ফুট। তোমার ঘড়ি অনুসারে তুমি ঠিক এক মিনিট দেখলে, টুকে রাখলে কতদূর গেল লোকটি—৭০৪ ফুট। ঐ লোকটি ছুটতে ছুটতেই নিজের ঘড়ি দেখে টুকলে—এক মিনিটে গেল ৭০৪ ফুট। সে আরো দেখলো দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যে তার চেয়ে আরো ৮ মাইল জোরে ছুটছে, সে গেল ঐ এক মিনিটে কতদূর; তার থেকে ৭০৪ ফুট এগিয়ে গেল, সন্দেহ নেই। এখন তুমি যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ সেখান থেকে দেখবে, দ্বিতীয় ব্যক্তিটি এক মিনিটে গিয়েছে ৭০৪+৭০৪=১৪০৮ ফুট। বাস্তবিকপক্ষে মেপে দেখলে পাবে তার চেয়ে কম—অতি সামান্য কম বটে, তবুও কম। এর কারণ, গতির সঙ্গে ঘড়ির কাঁটারও মাপ বদলে যায়—দুটি ঘড়িতে একই সময় দেয় না।

ব্যাপারটি আরো খানিকটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক। আইনষ্টাইনের নিজের এক উদাহরণ। একটি চলন্ত ঘর—মনে কর, ট্রেনের কামরা। কামরার ভিতরে একজন বসে দেখছেন, আর বাইরে রাস্তার ধারে একজন দাঁড়িয়ে দেখছেন। এখন কামরার ভিতরে ঠিক মাঝখান

থেকে দুটি আলোকরশ্মি সামনে-পিছনে দুধারের বিপরীত দেয়ালে ফেলা হলো। ভিতরের দর্শক দেখবে দুটি আলো এক সঙ্গে পড়ল দেয়ালের উপর। কারণ দেওয়াল দুটি আলোর কেন্দ্র থেকে সমান দূরে এবং আলোর গতিবেগ সব দিকেই সমান। কিন্তু বাইরের দর্শক দেখবে কি? সে দেখবে আলোককেন্দ্র স্থির নয়—তা ছুটছে গাড়ীর বেগে, এগিয়ে চলেছে গাড়ীর সামনের দেয়ালের দিকে আর সরে সরে চলেছে পিছনের দেয়াল থেকে। সুতরাং সামনের দেয়ালের দিকে ছুটছে যে আলো তা আগে গিয়ে পৌঁছুবে সামনের দেয়ালে। পিছনের দেয়ালের দিকে ছুটছে যে আলো তা সেখানে পৌঁছুবে পরে। তা হলে দেখা গেল, ভিতরের দর্শকের কাছে যে দুটি জিনিষ ঘটে একসঙ্গে, বাইরের দর্শকের কাছে তাই আবার আগে পরে। প্রচলিত ধারণা এবং প্রাচীনতর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা এটা। কারণ, তদনুসারে যা যুগপৎ তা সদাসর্ব্বদা যুগপৎ—পারম্পর্য্য হলো অটল, অচল নিয়ম। কাল জিনিষটি স্বয়ংসিদ্ধ, তার ধারা বস্তু-ঘটনা-অবস্থা নিরপেক্ষ।

কালের রহস্য তলিয়ে দেখা প্রয়োজন হবে। সময় আমরা নির্দেশ করি ঘড়ির কাঁটার গতি দেখে; অর্থাৎ একটা কাঁটা দেখে বলি মিনিটের কাঁটা; তার ডগা এক পাক দিতে (৩৬০ ডিগ্রি চলতে) যতটা সময় ব্যয় করে তার নাম দেই এক ঘন্টা। এ জন্যে তার দরকার বিশেষ একটা বেগে চলা। এই বিশেষ বেগের অর্থ কি? আমরা তা ঠিক করে নিয়েছি এইভাবে:—সূর্য্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘুরতে (অথবা বাহ্য-দৃষ্টিতে আকাশের এক স্থির বিন্দু থেকে ঘুরে আবার সেখানে ফিরে আসতে সর্য্যের) যে কাল অতিবাহিত হয় তার নাম দেই—বৎসর। এই অবকাশকে ভাগ ভাগ করে ইচছামত নাম দেই—মাস, ঘন্টা। কিন্তু এই যে বৎসরের মাপ তা অনড়, অচল, অপরিবর্তনীয় কিছু নয়।

কারণ ধর, বৃহস্পতি গ্রহে আছে যারা তাদের কথা। তাদের বৎসর অর্থাৎ সূর্য্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময়, তা হলো আমাদের বারো বৎসর। সুতরাং সেখানে সময় চলে অতি মন্থর গতিতে। বৃহস্পতির ঘড়ি আর আমাদের ঘড়ি এক তালে চলতে পারে না। মঙ্গল গ্রহ আবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে আমাদের ৮৮ দিনে। সুতরাং সেখানকার সময় সংক্ষিপ্ত, চলে দ্রুত। তারপর, পৃথিবী নিজের চারদিকে পুরা এক পাক দেয় যে সময়ে, তাকে আমরা বলি—দিন (অর্থাৎ দিনরাত্রি) ; তাকে ভাগ করি ২৪ ভাগে। প্রত্যেক ভাগের নাম দেই ঘন্টা। প্রাচীনেরা দিনরাত্রিকে ভাগ করতেন—অষ্ট প্রহরে বা একশ' দণ্ডে। কিন্তু মঙ্গল গ্রহ নিজের চারদিকে ঘোরে অতি ধীরে—তার একদিন আর এক বৎসর সমান।

এতে প্রমাণ হয় যে, সময়ের মাপ একটা আপেক্ষিক বস্তু। পৃথিবীর ঘন্টা, বৃহস্পতির ঘন্টা, মঙ্গলের ঘন্টা এক নয়। তোমার মিনিট আমার মিনিট এক নয়। প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব স্থিতি ও গতির উপর নির্ভর করে তার সময়। সত্য বটে, সাধারণতঃ এই পার্থক্য অতি সামান্য—তাতে কাজ চালানোর কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু কাজ চালানো তথ্য আর বৈজ্ঞানিক সত্য এক নয়। পরস্পরের তুলনা করে পার্থক্যটা আমরা কষে দেখতে পারি বটে, কিন্তু তাতে সময়ের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব প্রমাণ হলো না ; প্রমাণ হয় বিপরীত সত্যই। তাছাড়া এমন পরিস্থিতিও অসম্ভব নয়, যেখানে তুলনা সম্ভব হয় না—যেখানে কাল-বৈপরীত্য উপলব্ধিও হয় না। অবকাশ—দেশের হোক বা কালের হোক—নির্ভর করে গতির উপর। যে মাপকাঠি দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপি তার গতি পরিবর্তন কর, দেখবে বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে তা ছোট হয়ে চলেছে—শেষে আলোর বেগে চললে মাপকাঠির দৈর্ঘ্য হবে শূন্য। সেই রকম ঘড়িও যদি ছোটে, যত বেগে ছুটবে তার ঘন্টা-মিনিট তত বিলম্বিত

হবে। শেষে আলোর বেগে চললে তার সময় যাবে থেমে—Time must have a stop?

কালের এই লীলা-চাতুর্য্য সম্বন্ধে একটি সুপ্রাচীন কাহিনী আছে। তাই দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার করবো।

দুই সাধু মিলে স্নান করতে গিয়েছেন নদীতে। দুজনেই জলে নামলেন পাশাপাশি। একজন দিলেন ডুব—কিন্তু এ কি? ডুব দিয়ে তিনি কোথায় চলে এলেন? কোথায় উঠলেন এসে? এ কোন দেশ? আস্তে আস্তে চললেন মাঠ-ঘাট পার হয়ে—সব অজানা, অপরিচিত। এক গ্রামে এলেন। ক্রমে লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলো, আলাপ পরিচয় হলো। থাকতে যখন হবে, তখন কাজকর্ম্ম নিলেন, আস্তানাও তৈরি করলেন। ক্রমে ভুলে গেলেন অতীত জীবনের কথা। কত বৎসর কেটে গেল। তারপর বিয়েও করলেন। বিয়ের পর ছেলেপিলেও হলো—নাতিনাতনীর মুখ ক্রমে দেখলেন। বয়সও অনেক গড়িয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে ভগবানের নাম ও স্নান-আহ্নিক করবার জন্যে নদীর ধারে উপস্থিত। জলে নামলেন—দিলেন ডুব। মাথা তুললেন—কোথায়? স্বপ্নের মত, মনে হলো—সেই পুরানো জায়গায়, পাশেই জলে সেই পুরাতন সঙ্গী সাধুটি। বিমূঢ় হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখনো এখানে? আমি তলিয়ে যাই নি? সাধুটি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে উত্তর করলেন—সে কি? তুমি তো ডুব দিলে আর উঠলে, আধ মিনিটও জলের নীচে থাকান!

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুন, ১৯৫২

সরল আপেক্ষিকতাবাদ

একটা 'বল' তুমি মাথার উপরে আকাশে ছুঁড়ে দিলে। পরে দেখলে সেটা নীচে নেমে আসছে—তুম ঠিক াস্থর হয়ে দাড়িয়ে আছ, বলটা তোমার দিকে ছুটে চলে আসছে। আচছা, একটা পি পড়ে যাদ ঐ বলটার ওপরে থাকে, সে কিরকম দেখবে? সে দে বে—পৃথিবীটাই তার দিকে ছুটে আসছে, সে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে স্থির বলটার উপর। তাছাড়া আমরা সবাই জানি, রেলগাড়ি যখন ছুটে চলে, ভিতরে বসে আমরাও তার সঙ্গে ছুটে চলি ; কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে যখন তাকাই তখন দেখি—গাছপালা, জায়গাজমি ছুটে চলেছে পিছন াদকে, আমরা যে দিকে চলেছি তার উল্টো দকে। ব্যাপারটির অর্থ তলিয়ে বুঝলে এই রকম দাঁড়ায়—জিনিষের গতি নিরপেক্ষ কিছু নয়, আশপাশের জিনিষের সম্পর্কেই কেবল দেখা যায় জিনষের গতি। যেখানে কোন জিনিষ নেই, কিছু নেই, সব শূন্য—সেখানে জিনিষের গতি ধরবার বা নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই। আপেক্ষিকতাবাদের এই হলো গোড়ার সূত্র। এই মূল সূত্র থেকে উপসূত্র হলো (১) দুটি জিনিষ সমান বেগে চললে তাদের পৃথক গতি টের পাওয়া যায় না, হিসেব পাওয়া যায় না ; (২) দুটি জিনিষ যখন অসমান বেগে চলে তখনই ধরা যায়, মাপা যায় তাদের গতি-মান ; (৩) তারপর মানতে হয় আরো একটু ঘোরালো কথা, যার ইঙ্গিত দিয়েছি 'বল' বা রেলের উদাহরণে। সে কথাটি এই—কোন জিনিষ চলছে কিনা, তা ঠিক করতে হয় আর একটা স্থির জিনিষ পাশে রেখে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনটা চলছে আর কোনটা চলছে না তা বলা কঠিন, নিরপেক্ষভাবে বলা যায় না।

দ্রষ্টা যেখানে দাঁড়িয়ে, সর্ব্বদা ধরে নেওয়া হয়—সেখানে সেই স্থির। কিন্তু যে জিনিষকেই গতিমান বলে ধরে নিই না কেন, একটা স্থির আরেকটা গতিমান বা দুটাই গতিমান বিভিন্ন বেগে—একই কথা; উভয়ের সম্বন্ধ বা সম্বন্ধের ফলাফল একই থেকে যায়, তাতে কোন পরিবর্তন হয় না।

এখানে তবে একটা নতুন তথ্য পেলাম—আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ তত্ত্ব একটি। তা হলো গোষ্ঠী বা মণ্ডলী তত্ত্ব—ইংরাজীতে যার নাম সিস্টেম্, চলতি ভাষায় যাকে বলা যায় 'কোট'। একসঙ্গে একইযোগে চলে যারা সেই সব ব্যষ্টিদের নিয়ে এক একটি গোষ্ঠী বা মণ্ডলী—অন্যকথায় বলা যেতে পারে, একটি গোষ্ঠী অন্য আর একটি গোষ্ঠীর তুলনায় স্থির। এই যেমন পৃথিবী এবং তার অন্তর্গত স্থাবরজঙ্গম অধিবাসী সব মিলে একটা মণ্ডলী। সূর্য্যের সম্পর্কে পৃথিবী স্থির, সূর্য্য গতিশীল (দৃশ্যতঃ)। সেই রকম সূর্য্যমণ্ডলী, অর্থাৎ সূর্য্য এবং তার গ্রহ-উপগ্রহাদি একটা মণ্ডলী—তারকামণ্ডলীর সম্পর্কে—তারকামণ্ডলী স্থির, তার ভিতর দিয়ে চলে ফিরে সূর্য্যমণ্ডলী। নিকটের তারকামণ্ডলী ছাড়িয়ে আরও দূরের জ্যোতিষ্ক যাদের নাম নীহারিকাপুঞ্জ—নীহারিকাপুঞ্জও আছে আবার নানা দূরদূরান্তের। এরাও সকলে বিভিন্ন মণ্ডলীর। এই যে প্রত্যেক মণ্ডলী, বলেছি তারা মণ্ডলী, কারণ সমষ্টি হিসাবে তাদের প্রত্যেকের রয়েছে বিভিন্ন গতিবেগ। তবে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গণ্ডী বা কোটের মধ্যে প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম সব সমানে মেনে চলে; অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম—যে জিনিষ যত দূরে তার আকর্ষণ-শক্তি তত কম এবং এই কমের সম্বন্ধ হলো দূরত্বের বর্গফলের সঙ্গে, অথবা ওজন বা ভারের আকর্ষণ-বিকর্ষণের যে বিধি তা সর্বত্র এক ভাবে খাটে, তার ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু একটা পার্থক্য আছে। পার্থক্য হলো এই —মাপের সংখ্যা এক হলেও, পরিমাণ এক নয়। দুটি মণ্ডলীর গতি

যদি ভিন্ন হয় তবে একটিতে এক ফুট যতখানি, অন্যটিতে এক ফুট বলতে ততখানি বুঝায় না। একটিতে এক মিনিট যতটা সময় অন্যটিতে ততটা সময় নয়। এ যেন বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাট্টার হারের পার্থক্য। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ত্রই টাকার চল; কিন্তু টাকার মূল্য সমান নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদানের জন্যে মুদ্রার মূল্যান্তর প্রয়োজন। ঠিক সেই-রকম বিভিন্ন গতির মণ্ডলীদের পরস্পরের এই রকম মূল্যান্তর বা মানান্তর প্রয়োজন, যদি একটিকে দিয়ে আর একটি বুঝতে হয় বা দুটির সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয়। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এর নাম Lorentz Transformation বা লরেঞ্জ রূপান্তর।

স্থান ও কালের পরিমাণ নির্ভর করে গতির উপর। এ কথার প্রমাণ? প্রমাণ অর্থ পর্য্যবেক্ষণ, বাস্তব নিরীক্ষণ, ঘটনার বিবরণ। এই প্রমাণের জন্যে তথ্য সংগ্রহ এবং বাস্তব ঘটনাকে গুছিয়ে ধরতে গিয়ে একটা চমৎকার ব্যাপার ধরা পড়েছে। জিনিষের গতি আমরা মাপি কি দিয়ে? শেষটা তা দাঁড়ায় গিয়ে আলোর গতির সঙ্গে তুলনা করে। কারণ আলোর গতি সবচেয়ে বেশী বেগবান। কিন্তু মজার কথা এই যে, অনেক পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে—আলোর চেয়ে বেশী গতি আছে এমন কিছু তো নেই-ই, অধিকন্তু আলোর গতিবেগও আবার অপরিবর্তনীয়। আলোর ঢেউ ছোট বড় (দৈর্ঘ্যে ও উচ্চতায়) হতে পারে, তার পুনঃপৌনিকতায় তারতম্য হতে পারে, কিন্তু বেগ সর্বত্র সমান। এ সিদ্ধান্ত হতে বাধ্য, অন্যরকম হতে পারে না—কারণ আলো ধরেই সব গতির মাপ। যে মাপ অন্য সকল মাপের নির্দ্দেশক তাকে তো স্থির অপরিবর্ত্তনীয়ই থাকতে হয়। এ হলো জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞার মত। আলোর গতিতে যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না তার পরীক্ষা পদ্ধতি এরূপ :—কোন বিন্দু থেকে আলোর একটি রশ্মি নিক্ষেপ করা হলো পৃথিবীর গতি যেদিকে তাকে অনুসরণ

করে, অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূবে (পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘুরছে পশ্চিম থেকে পূবে) আর এক বিন্দুতে ; ঠিক ততটা দূরেই আর একটি রশ্মিকে ফেলা হলো আড়াআড়ি, অর্থাৎ উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে, একই জায়গা থেকে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আলোটি ফিরে আসতে সমান সময় নেয়, কোন ইতরবিশেষ হয় না। যদিও (নিউটনীয়) গতিশাস্ত্র অনুসারে অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল ; কারণ, পৃথিবীর গতি অনুসরণ করে যে আলোরেখা, তার গতি হওয়া উচিত—আলোর গতি + পৃথিবীর গতি। আর পৃথিবীর গতির আড়াআড়ি চলে যে আলো-রেখা তার গতি হওয়া উচিত—আলোর গতি – পৃথিবীর গতি। কার্য্যতঃ কিন্তু তেমনটি দেখা যায় না। এটাই হলো মলিমাইকেলসন পরীক্ষা। বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন—নানা জনে নানা ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে লেগে গেলেন।

একটা চতুর মীমাংসা হলো এই যে, গতির সঙ্গে সঙ্গে মাপকাঠিও বাড়ে কমে। যেহেতু মাপের মান বদলে যায়, সেহেতু আলোর গতিতে পার্থক্যও ধরা পড়ে না। এক তবে প্রশ্ন এখানে—মাপের মান কি পরিমাণে বদলে যায় ? ঠিক সেই পরিমাণে যাতে পার্থক্য ধরা পড়ে না। এ রকম সুবিধামত সিদ্ধান্ত আপত্তিজনক ; কিন্তু তাছাড়া অনেকে মাপের পরিমাণ-পরিবর্ত্তনের গণনা করে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আইন্-ষ্টাইন দিলেন নূতন ব্যাখ্যা (একটা পুরাতন অভিজ্ঞতাকেই ধরলেন নূতন রূপ ও ব্যঞ্জনা দিয়ে)। একটা বদ্ধ বা সীমাবৃত মণ্ডলের মধ্যে থেকে সেই মণ্ডলের সমষ্টিগত সাধারণ গতি কিছু ধরা যায় না—যেমন পৃথিবীর উপর থেকে পৃথিবীর গতি নজরে পড়ে না। সেই রকম আলোর ধারা নিয়ে, অর্থাৎ যতদূর তার প্রসার সমগ্র পরিধিটি ঘিরে হলো একটি মণ্ডলী। তার অর্থ স্থূলসৃষ্টি সবটাই, জড়ের গোটা রাজ্য আলোর মণ্ডলী। অন্য সব জড় বস্তুর তুলনায়, অন্য যে কোন

জিনিষের সম্পর্কে আলোর গতিতে তারতম্য নির্ণয় করা অসম্ভব ও নিরর্থক। আলোর গতিতে তারতম্য আবিষ্কার করতে হলে তার পাশে ধরতে হবে এমন জিনিষ যার গতি আলোর চেয়ে বেশী। কিন্তু সে রকম জিনিষ নেই।

বললাম আলোর মণ্ডল—আলোর রেখা যতদূর যায় সেই প্রসার বা ক্ষেত্র। ঠিক এই কথা ধরে আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন। আলোর মণ্ডল সত্যসত্যই মণ্ডল, অর্থাৎ পূর্ব্বতন বা নৈষ্ঠিক বিজ্ঞান যে বলে, আলোর রশ্মি চলে সোজা রেখায় তা আর ঠিক নয়—সে চলে বাঁকা রেখায়। শুধু তাই নয়, ঘুরে আবার উৎপত্তিস্থলেই ফিরে আসে। ঐ যে তারাটি সামনে দেখছ্ পূব-আকাশে তার আলো যে সোজা সামনা-সামনি চলে এসেছে তোমার কাছে তাই তুমি দেখছ্—এমন নাও হতে পারে। হয়তো ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে ফিরে এসেছে! আপেক্ষিকতাবাদ তাই বলছে স্থষ্টি হলো একটা বৃত্ত বা বৃত্তাভাস, ব্রহ্মাণ্ড সত্যসত্যই ডিম্বাকার—তার সীমানা নেই। অন্তিম, পার বা শেষ বলে কিছু নেই, তা অশেষ কিন্তু সসীম (endless কিন্তু finite)। অবশ্য ডিম্বাকার বলতে মনে হতে পারে, ডিম্বের বাইরে রয়েছে শূন্য আকাশ, সেই আকাশের মধ্যে ভাসছে যেন ডিম। বলা বাহুল্য, স্থষ্টির পক্ষে এ চিত্র ঠিক নয়—সমগ্র স্থষ্টিটাই একটা ডিম, তাই বাইরে কিছু নেই। সেখানে সব জিনিষ চলে ডিমের পৃষ্ঠ-তল ধরে, সুতরাং বঙ্কিম রেখায়। ভারতীয় পুরাণকারের দৃষ্টিতে স্থষ্টির হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তিও কতকটা এই ধরনের ছিল।

এ থেকে আর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন আইনষ্টাইন। পূর্ব্বে-কার বিজ্ঞান জড়শক্তির কর্মবেগ বা প্রবেগ বলে একটা জিনিষ মানতো —পদার্থে পদার্থে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্বন্ধ—সাধারণভাবে, ঘটনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। কিন্তু এখন বলা হয় এই ধরনের কথা যে, জিনিষে-

জিনিষে, কি কার্য্য-কারণে একটি হতে আর একটিতে সঞ্চারিত হয়—গতিবেগ বা ধাক্কা বা টান এমন কিছু নেই। জিনিষ চলে—সচল জগতে যা-কিছু সব চলমান (যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ) অন্তর্নিহিত কি বহিরাগত প্রেরণায় নয়, চলে ক্ষেত্রের বক্রতা অনুসরণ করে বলে। উঠান সমতল এবং তার উপর আমরা যে নেচে চলি তা নয় ; উঠানটিই বাঁকা তাই তার উপর দিয়ে চলতে গেলেই দেখা যায় যেন আমরা নেচে চলেছি ! মাধ্যাকর্ষণের অর্থ এই—বস্তুতে বস্তুতে আকর্ষণ কিছু নেই, কিন্তু বস্তুর আশেপাশের ক্ষেত্রটা নীচু হয়ে গিয়েছে, তাই সেখান দিয়ে জিনিষ (আলোর রেখা) চলে নীচুতল অনুসরণে। তাই মনে হয় তা যেন আকৃষ্ট হচ্ছে।

তার অর্থ পরিশেষে দাঁড়ায় এই যে, যাকে বলে বস্তু অণু বা অণুসংগ্রহ, তাদের নিজস্ব পৃথক সত্তা বলে কিছু নেই। আমরা দেখি বটে, আকাশের পটে গোটা গোটা জিনিষ সব—যেন আপনভাবে ও ভঙ্গীতে চরে বেড়ায়। কিন্তু ফলতঃ তা নয়। ও-রকমের ব্যষ্টিও হলো ইন্দ্রিয়-বিভ্রম। আকাশটাই কুঞ্চিত এবং যেখানে যেখানে কুঞ্চন বা পাক পড়েছে সেখানটায় জড়-ব্যষ্টির ধর্ম দেখা দিয়েছে, জড়-ব্যষ্টির রূপ গ্রহণ করেছে। প্রাচীনতর নিউটনীয় যুগে প্রাকৃতিক নিয়ম তিনটি স্বতঃসিদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। (১) আকাশ = শূন্য অবকাশ (২) তাকে পূর্ণ করে আছে অদৃশ্য অস্পৃশ্য সর্বব্যাপী জড়-মূল ঈথর (৩) জড়ের স্থূলাকার সব। আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রপাত করেন দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধকে নাকচ্ করে দিয়ে। ঈথরের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হলো মাইকেলসন্-মর্লির পরীক্ষায় ; ঈথরের বস্তুতঃ প্রয়োজনও রইল না। শূন্য আকাশে জড়খণ্ড বা চূর্ণের গতায়াত সব ব্যাখ্যা দেয়। নিউটনীয় চিত্রও মোটামুটি এইরকম ছিল বটে, কিন্তু জড় খণ্ড যখন ধরা হতো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারে এবং অপেক্ষাকৃত কম গতিশীল অব-

স্থায়। এলো যখন আলোর গতি আর বিদ্যুৎ-চূর্ণের আকার তখন নিউটনীয় বিধিবিধান অচল হয়ে পড়লো।

অবশ্য সমস্যা বা বিপত্তির অবসান ওখানেই ঘটলো না। নিউটনীয় সমস্যাই আবার নতুনভাবে সূক্ষ্মতর স্তরে দেখা দিল। নিউটনীয় সমস্যা ছিল—আকাশে যদি ছড়িয়ে থাকে পৃথক পৃথক সব জড়পিণ্ড তবে তাদের প্রত্যেকের গতি ও স্থিতির কথা বুঝতে পারি। প্রত্যেকে আছে বিশেষ বিশেষ বেগে, বিশেষ দিকে ; কিন্তু যখন তুলি পরস্পরের আকর্ষণের কথা (মাধ্যাকর্ষণ) তখন জিজ্ঞাসা করতে হয়, পরস্পরের মধ্যে এই যে আদান-প্রদান তা চলে শূন্যে শূন্যে ? শূন্যের ভিতর দিয়ে বস্তুরা পরস্পরকে স্পর্শ করে কি ভাবে ? ঈথরকে সেজন্যে মেনে নিতে হয়েছে—সব বস্তুর আশ্রয়স্থলরূপে, যাকে ধ'রে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ সম্ভব হয়। কিন্তু যখন দেখা গেল জড়পিণ্ড নয়, প্রকৃতির মূল উপকরণ, অর্থাৎ আকাশকে ছেয়ে আছে যা, তা হলো বিদ্যুৎকণা—বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তির কেন্দ্র বা বিন্দু সব, তখন প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল সমস্যার মীমাংসা বেশ হয়ে গেল ; ফাঁক আর কিছু চোখে পড়লো না। কারণ, বলি বটে বিদ্যুৎকণা, কিন্তু আসলে তা হলো বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র। গোড়ায় ম্যাক্স্‌ওয়েল, পরে লরেঞ্জ এই তথ্যটির ওপর জোর দিয়ে অনেক মুস্কিল আসান করে দিয়েছিলেন। ক্ষেত্র অর্থ, শক্তির আদান-প্রদানের ক্ষেত্র—শক্তি যেখানে জড়িয়ে আছে, চলছে ফিরছে। আকাশ শূন্য নয়, আবার ঈথর নামক অদ্ভুত কাল্পনিক বস্তু দিয়ে পূর্ণও নয়। তবে বিজ্ঞান-দৃষ্টি যখন আরো কাছে আরো ছোটর দিকে গিয়ে পড়লো তখন ফাঁক ধরা দিতে লাগল ক্রমে। যাকে বলা হয় বৈদ্যুতিক শক্তি তা তো শক্তিগর্ভ বিদ্যুৎকণা ছাড়া আর কিছু নয় ? যাকে বলি বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র—তা তো এইরকম সংখ্যাতীত কণার সমষ্টি মাত্র। বিশেষতঃ যখন ধরা পড়লো আলো পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় আলোকণার

পারস্পরিক ধাক্কায়, একটানা ধারায় নয়, তখন স্বীকার করতে হলো নিউটনীয় সমস্যাই আবার ফিরে এসেছে। যত ক্ষুদ্র হোক, যত সংখ্যাতীত হোক, শুধু কণাই যখন রয়েছে, তখন তাদের মাঝে মাঝে ফাঁকও রয়ে গেছে; অর্থাৎ বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্রিয়া চলছে শূন্যকে আশ্রয় করে। অবশ্য কণা যাকে বলি তার ধর্ম একদিকে ঢেউ-এর মতও বটে, কিন্তু তাতে চিত্রের পরিবর্ত্তন কিছু হয়না। ঢেউ প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা, ছাড়া-ছাড়া।

আবার আইনষ্টাইন এসে চিত্রটা সত্যই ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন—কণার নিজস্ব কোন বেগ নেই, প্রেরণা নেই—শক্তির ভাণ্ডার তার মধ্যে নয়। কণার ধর্ম যাকে বলি, তা হলো বাস্তবিক ক্ষেত্রের ধর্ম্ম—একথা আগেই বলেছি।

অবশ্য আজকাল বিজ্ঞান এমন ছুটে চলেছে যে, আইনষ্টাইনও এখন পিছনে পড়ে যাওয়ার মত হয়েছেন। নিরপেক্ষ দেশ-কাল না রাখলেও, অর্থাৎ যে দেশ ও যে কাল রয়েছে পৃথকভাবে, স্বাধীনভাবে, বস্তুর উপর নির্ভর না করে—স্বয়ম্ভূ স্বতন্ত্র দেশে ও কালে বস্তু আর ঘটনা আশ্রয় পেয়েছে মাত্র। এই প্রাচীন দেশ ও কাল না রাখলেও আইনষ্টাইন তবুও রেখেছিলেন দেশ-কাল সম্মিলিত একটা বাহ্য কাঠামো যার মধ্যে আঁটা রয়েছে বস্তু বা ঘটনা। একটা সার্বভৌমিক দেশ ও কাল না রাখলেও তিনি রেখেছিলেন বিশিষ্ট দেশ-কাল, প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার নিজস্ব দেশ-কাল। তবু দেশ-কাল ব্যষ্টিগত গুণ হলেও তা ব্যষ্টির বাইরে, ব্যষ্টির জড়-আশ্রয়-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে নতুন তরঙ্গ-বিদ্যায় (wave mechanics) দেশ-কালকে বস্তুর এতখানি ভিতরে স্থান করে দেওয়া হয়েছে যে, তা হয়ে উঠেছে বস্তুর ধর্ম্ম—গৌণ নয়, মুখ্য গুণ।

এ সবই একটা নিদারুণ অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে চলেছে, বৈজ্ঞানিকের কি কোন দ্রষ্টার বাইরে নিরপেক্ষ দৃশ্য আর নেই—থাকলেও

তা বৈজ্ঞানিকের বিষয় নয়। বিষয়ী-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বাধীন বিষয় আর নেই। বিষয়ের মধ্যে বিষয়ী এমন ওতপ্রোত, বিষয়ের ধর্ম্মে এতখানি বিষয়ীর ধর্ম্ম লিখিত হয়েছে যে, জড়বস্তুকে কি জড়ক্ষেত্রকে পর্য্যন্ত আর জড় বলা চলছে না। জড়ের নতুন অর্থ, জড়-নয় অর্থ দিতে হয় প্রায়।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুলাই, ১৯৫২